দুরন্ত যাত্রী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

শৈব্যা পুস্তকালয় ● পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৮/১ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৭১

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২ হইতে শ্রীগোপালচন্দ্র বস কর্তৃক প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ প্রেস ৬ শিবু বিশ্বাস লেন কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

এক

মল্লিকবাড়ী থেকে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বের হতে না হতেই ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো। নতুন রাস্তার উপর বিকল দেওয়ালের আড়ালে হাবু আশ্রয় নিল। নিধু এক কোণে রোয়াকের উপর বসেছিল, ডাকলো—এদিকে আয়, এক হাত বাঘবন্দী খেলি।

হাবু বললো—ঘুঁটি?

নিধু বললো—তাইতো, যা বৃষ্টি হচ্ছে, দুটো ইটপাটকেলও কুড়িয়ে আনার উপায় দেই। যাক গে, খেলবো না।

নিধু উদাস চোখে তাকিয়ে রইল আকাশ-ভরা মেঘের পানে। কিছুক্ষণ পরে বললো—হাবু, চুপ করে বসে থাকতে আর ভালো লাগে না। তোর গলাটা বেশ, একখানা গান গা—

হাবু পাকা গাইয়ে নয়, তাকে বেশী সাধাসাধি করতে হয় না, সে তখনই সুর ধরলো—

একটি পয়সা দাও গো বাবু, একটি পয়সা দাও,
পুরাণো জুতো, ময়লা জুতো পালিশ করে নাও—
বাবুজী, পালিশ করে নাও—

নিধু হাঁটুর উপর তবলা পিটতে সুরু করলো।

ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। ছাতাহীন ক'জন লোক একে একে সেখানে জড়ো হয়েছে; তাদেরই একজন হাবুকে লক্ষ্য করছিল অনেকক্ষণ ধরে। বৃষ্টি থেমে যাবার পর একে একে সবাই চলে গেলে লোকটি হাবুকে ডাকলো—এই ছোকরা, শোন।

—কী?

—তোর নাম কিরে?

—কেন?

—তোর গলা ভালো, বেশ গাইতে পারিস।

হাবু খুশি হয়ে বললে—বাবার কাছে শিখতাম যে।

—তোর বাবা ভালো গাইতে পারতো।

—বাঃ। শহরে বাবার মত কীর্তন গাইতে পারতো নাকি কেউ।

—কোন শহরে? কলকাতায়?

—না না, কলকাতায় নয়, কাঁথী। আমরা যে মেদিনীপুরের লোক গো।

—মেদিনীপুরের লোক···বন্যার পরে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

—পালিয়ে আসবো কেন গো বাবু? ভেসে গেছিলাম, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যেসীরা আমাকে বাঁচিয়েছে। তারপর কত খুঁজলাম, বাবা মা ভাই কারুরই আর হদিস পেলাম না। বাড়ীঘর সব তো শেষ হয়ে গেছে, কোথায় আর যাই? মিশনের সন্ন্যেসীদের সঙ্গে চলে এলাম এখানে।

—এখানে মল্লিকবাড়ী খাস, আর পথে পথে ঘুরে বেড়াস—এই তো?

—কি করবো বলুন, ইস্কুলে পড়তাম ক্লাস এইটে। ভেবেছিলাম কলকাতায় হয়তো কোন সুবিধা হবে···

—তা দেখ আমি যদি তোকে পড়ার সুবিধা করে দিই?

—আপনি।

হাবু এবার লোকটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল: খদ্দর পরা, হাসিখুসি মুখ, কংগ্রেসের লোক বলেই মনে হয়, বললো—আপনি আমাকে পড়াবেন? কিন্তু থাকবো কোথায়? খাবো কি? তবে তো পড়া।

—কেন, থাকবি আমার বাড়ীতে, সেখানেই খাবি-দাবি, পড়বি।

—কাজ কি করতে হবে ?

—তেমন ভারি ঝক্কির কাজ কিছু নয়, তুই তা পারবি। আমার বাড়ীতে গেলেই সব তোকে বলে বুঝিয়ে দোব।

ছেলেবেলা থেকে বাপের মুখে সে বড় বড় লোকের গল্প শুনে এসেছে; ভেবেছে বড় হয়ে সে-ও অমনিই একটা কিছু হবে। বিদ্যাসাগর মশাই জন্মেছিলেন মেদিনীপুরে, তত বড় না হলেও একজন বীরেন শাসমল হবার চেষ্টা সে করবে। তখনই সে উঠে দাঁড়ালো, বললো—চলুন, আমি রাজী।

এক বস্তির মধ্যে ঢুকে লোকটি ডাকলো—রাজা। রাজা।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বছর দশেকের একটি ছেলে বেরিয়ে এলো, বললো কী ?

—এ কে বল দিকি ?

রাজা একবার হাবুর মুখের পানে তাকালো, তারপর বললো—কে ?

—এর সঙ্গে কাল থেকে তুই বেরুবি, বুঝলি ?

রাজা ঘাড় নাড়লো।

কোথায় বেরুতে হবে হাবু কিছুই বুঝলো না, সেকথা জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবছে এমন সময় প্রশ্ন হল—খিদে পেয়েছে ? কিছু খাবি ?

হাবু তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিল। লোকটি পকেট থেকে একটি ছ' আনি বের করে রাজার হাতে দিয়ে বললো—ছুটে যা, চার পয়সার মুড়ি আর চার পয়সার বাদামভাজা। যাবার আগে গোটা কতক পেঁয়াজ আর ছুরীখানা দিয়ে যা।

মুড়ি খেতে খেতে লোকটি বললো—আমার নাম জানিস তো, জগন্নাথ দত্ত, সবাই আমাকে জগাদা বলে, তুইও আমাকে জগাদা বলবি।

তারপর বললো—তুই কখনও ভিক্ষে করেছিস ?

হাবু বললো—আগে তো করতাম, কিন্তু যা পেতাম তাতে কিছু হত না, তাই ছেড়ে দিয়েছি।

—কিছু হয় কি না হয় সে আমি বুঝবো'খন। তুই কাল থেকে রাজার সঙ্গে বেরুবি। রেলগাড়ীতে ভিক্ষে করতে হবে, বুঝলি? রাজা তোর সঙ্গে যাবে'খন। ও সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে, ও ভারী এক্‌স্‌পার্ট।

তারপর ঢক্‌ঢক্‌ করে এক ঘটী জল খেয়ে জগাদা বললো—রাজা দোয়াত-কলমটা নিয়ে আর তো, একটা গান বেঁধে দিই, কাল ট্রেনে গাইবি।

পরদিন জগাদা দু'জনকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল।

গাড়ী ছাড়ার আগেই হাবুর হাত ধরে রাজা একখানি কামরায় উঠে পড়লো, হাবুকে বললো—নে, গা—

হাবু বললো—আমার কেমন-কেমন লাগছে, গান শুনে পয়সা দেবে তো?

—দেখ না, সন্ধ্যের মধ্যে চার-পাঁচ টাকা হয়ে যাবে।

হাবু একবার কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সুর ধরলো—

একটি পয়সা চাই গো বাবু একটি পয়সা চাই—
দু'ভাই মোরা তোমার কাছে চাট্টি খেতে চাই।
মেদিনীপুরের বন্যা ঝড়ে
যা কিছু সব নিয়েছে হরে,
মা-বাপ-হারা দু'ভাই মোরা ভিক্ষে মাগি তাই।—

সামনে হাত পেতে দাঁড়াতেই একটি ছোকরা বলে উঠলো—মেদিনীপুরে থাকিস বায়োস্কোপের গান শিখলি কোত্থেকে?

রাজা তাড়াতাড়ি বললো—এক বাবু বেঁধে দিয়েছেন।

তারপর কতজন কত কথা জিজ্ঞাসা করে। যারা দেয় তারা কিছু না বলেই দেয়, যারা দেয় না কিছুই তারাই কথা বলে বেশী।

রাজা সকল্ কথারই জবাব দেয়, বলে—চটলে কাজ হয় না, আমরা যে ভিখিরী।

বিকালের দিকে হাবুর গলা জ্বালা করে, বললো—আর তো পারছি না।

রাজা বললো—চল্, দু'পয়সা করে আলুর চপ আর এক কাপ্ করে চা খাওয়া যাক্।

—এখানে আলুর চপ কোথায় পাবো?

—আয় আমার সঙ্গে—বলে রাজা শ্রীরামপুরের প্লাটফর্ম থেকে বের হয়ে সিনেমার সামনে হাবুকে নিয়ে এলো। ছোট একটি দোকানে আলুর চপ আর পেঁয়াজী ফুলুরী ভাজা হচ্ছে, বললো—নে কেন্।

গরম গরম আলুর চপ খেতে বেশ লাগে, দু'জনে একেবারে দু'আনার খেয়ে ফেললো। রাজা বললো—নে, এবার এক কাপ করে চা—

হাবু বললো—জগাদা আবার বকবে না তো?

—কত হয়েছে জানবে কেমন করে? যা দোব তাই নেবে।

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে জগাদার হাতে হাবু চৌদ্দ আনা পয়সা দেয়।

জগা বললো—মাত্র চৌদ্দ আনা কিরে? এত কম?

রাজা বললো—ডবল পয়সা কিনা, লোকে সহজে দিতে চায় না।

জগাদা বললো—কিন্তু এতো কম হলে এই বাজারে চালাবো কেমন করে? তোদের দুটোর খাওয়া পরা চালাতে হবে তো।

কিন্তু জগাদার এই আফশোষ স্থায়ী হয় না, পরদিনই হাবু এনে দেয় সাড়ে তিন টাকা।

তারপর থেকে রোজই তিন-চার টাকা হতে থাকে।

শেষে হাবুর কাছে এটা একটা চাকরী হয়ে দাঁড়ালো। সকাল

আটটা বাজতে না বাজতেই জগাদা তাড়া লাগায়—নে নে চটপট খেয়ে নে হাবু, এবার বেরুতে হবে, ন'টা চল্লিশের গাড়িটা আজ ধরা চাই।

ক'দিন পরে হাবু একদিন জিজ্ঞেস করলো—তুমি যে আমাকে পড়াবে বলেছিলে জগাদা?

—নিশ্চয় পড়াবো। কিন্তু এখন তোর সময় কোথা, সন্ধ্যার সময় এসে তুই তো একেবারে এলিয়ে পড়িস। তখন কি আর পড়া চলে? তার উপর আমি চাই তুই ইতিমধ্যে পড়ার খরচটা জমিয়ে ফেল, তাহলে পরে নির্ঝঞ্ঝাটে···

—কিন্তু টাকা তো সবই আমি তোমাকে এনে দিচ্ছি, আমার টাকা জমবে···

—ওই থেকেই তোর জমছে। থাকা-খরচ খাওয়া-খরচ বাদ দিয়ে টাকা পিছু দু'আনা করে আমি তোর জন্যে রেখে দিই যে।

—সত্যি?

—দেখিস্ তোকে আমি মানুষের মত মানুষ করে ছেড়ে দোব, তখন বলবি জগাদা না থাকলে এতো হত না।

হাবুর মনটা খুসিতে ভরে ওঠে। ছেঁড়া চাটাইটার উপর শুয়ে সে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন বুনে যায় মনে মনে।

রাজা সব শুনেছিল, পরদিন হাবুকে একলা পেয়ে বললো—তোকে পড়াবে জগাদা টাকা দিয়ে? তবেই হয়েছে। সে লোকই সে নয়।

—সে তো আমার টাকা···

—সে যারই টাকা হোক, যতক্ষণ জগাদার পকেটে আছে, ততক্ষণ তারই।

দেবে না?

—কখ্‌নো না।

—তবে যে কথা দিলে ?

—কথা তোকে দিয়ে যাবে, যদ্দিন ও বোবা না হচ্ছে।

—এমনি লোক নাকি ?

—বিশ্বাস না হয় চেয়েই দেখ না!

—আচ্ছা, আজই চাইব।

—বলবি, একখানা কাপড় কিনবো।

সেদিন রাত্রেই হাবু বললো—জগাদা, কাল সকালে আমাকে দুটো টাকা দেবেন তো, একখানা কাপড় কিনবো।

—এখন কাপড় কিনবি কিরে, এখন যে বেজায় দাম!

—আমার এই কাপড়খানা একদম ছিঁড়ে গেছে।

—তা হোক, ওইতেই এখন চালিয়ে নে। মাস দুয়েক পরে একেবারে পূজার সময়···

—সেই পুজোর সময়! তদ্দিন আমি পরবো কি ? থাকগে, তোমায় আর কিনে দিতে হবে না। আমার যে টাকা তুমি আলাদা করে রাখছ তাই থেকেই আমাকে এখন দাও।

—টাকাকড়ি কি আর হাতে কিছু আছে রে, বুঝছিস তো কী বাজার···

—কিন্তু কাপড় না হলে আমি আর বেরুতে পারছি না।

—ইস্ ভারী আমার লোক রে। পথে পড়েছিলি, কুড়িয়ে আনলাম, রাজার হালে রেখেছি। এখন আবার এটা চাই, ওটা চাই—

—তার মানে ? তুমিই তো বলেছ টাকায় দু' আনা করে আমার জমছে। আজ পর্যন্ত আমি তোমাকে তেষট্টি টাকা ন' আনা দিয়েছি···

—দিয়েছিস তো দিয়েছিস, তার হয়েছে কী ? বলেছি তো সে সব তোর পড়াশুনায় খরচ হবে।

—বাঃ—তা বলে এখন যা দরকার তা পাবো না ?

—না। আমার কানের কাছে এখন ঘ্যান ঘ্যান করিস নে বলছি, যা—বেরো আমার সামনে থেকে।

চোখ মুখ এমন করে জগাদা এগিয়ে এলো যে মার খাবার ভয়ে হাবু চুপ করলো। চোখে পড়ল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রাজা হাসছে।

বাইরে আসতেই রাজা বলল—কী আমি বলিনি?

—আচ্ছা দেখ্, আমিও আদায় করতে পারি কিনা?

পরদিন সকাকে জগাদা তাড়া দিতেই হাবু বললো—আজ আর আমি বেরুবো না জগাদা।

—কেন?

—আমার সব পাওনা আগে চুকিয়ে দাও, তারপর···

—বটে! পথে পড়েছিলি, তুলে এনে খাওয়ালাম পরালাম এখন কিনা আমাকেই চোখ-রাঙানো!—জগাদা ঠাস করে হাবুর গালে এক চড় বসিয়ে দিলে।

হাবুরও মেজাজ গেল চড়ে, বললো—তুমি আমাকে ঘর থেকে খাওয়াচ্ছ, না? আমি যে রোজ চার-পাঁচ টাকা ভিক্ষে মেগে আনি সেটি কিছু না?

—আবার কথা, বেরো বলছি আমার সামনে থেকে—এখ্খনি বেরো—জগাইদা তেড়ে এলো, হাবুও পথে বেরিয়ে পড়লো।

রাজা দাঁড়িয়েছিল, হাবু ডাকলো—চল্ রাজা, চল—

—আমি কোথায় যাবো তোর সঙ্গে?—রাজা বলে উঠলো—ওই মল্লিকবাড়ীর ঘ্যাট খেয়ে ফুটপাতে শুয়ে থাকতে আমি পারবো না।

হাবু আকাশ থেকে পড়লো, খানিকক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাজার মুখের পানে তাকিয়ে, তারপর পা চালালো সোজা পথে।

তখনও ন'টা বাজেনি। ঠনঠনের লাহাদের দারোয়ান তখন ছোলা আর জিলিপি দেওয়া সুরু করেছে। হাবু সেখানে এসে

বসলো। তারপর ছোলা আর জিলিপি চিবুতে চিবুতে চললো মল্লিকবাড়ীর দিকে।

নতুন রাস্তার মোড়েই নিধুর সঙ্গে দেখা, বললো—আরে, এরই মধ্যে যাচ্ছিস কোথা? এখন ঢের দেরী, সেই বেলা বারোটা। আয় ততক্ষণ একটু বাঘবন্দী খেলি—

হাবু তার পাশে গিয়ে বসে পড়লো। বাঘবন্দীর ছক কাটতে কাটতে নিধু বললো—ক'দিন তো তাকে দেখিনি, ছিলি কোথায়। পরশু বাগবাজারে কাঙালী বিদায় হয়ে গেল। কী যে খাইয়েছিল মাইরী, কী বলবো···এক একটা দরবেশ এই এতো বড়....

নিধুর সব কথা হাবু শোনে না, সে তখন রাজার কথা ভাবছিল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষে আঁচবার জন্য একটি টিওবওয়েলের সামনে দাঁড়িয়ে হাবু হাত চাটছে, এমন সময় কোথা হতে রাজা এসে হাঁক দিল—কিরে হাবু?

হাবু অবাক, বললো—তুই চলে এলি যে?

—চলে আসবো না তো কি, থাকবো ওই জগাবেটার কাছে?—

—তখন যে বললি, যাবো না, যা?

—তোর মত বোকা নাকি আমি? এদ্দিন ধরে ব্যাটাকে এতো টাকা দিলুম, আর আজ কিনা খালি হাতে চলে আসবো? এই দেখ,—বলে, কোমরে জড়ানো কাপড়ের একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে রাজা বললো—বাক্স ভেঙে নিয়ে এসেছি একত্রিশ টাকা···

—বলিস কি! যদি ধরতে পারে?

—ধরলে কি হবে, রাস্তায় লোক নেই? বলবো—আমি ওকে চিনিনে, আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে,' তখন দেখবি মজা!

—তা না হয় হ'ল, কিন্তু টাকাগুলো কি করবি?

—ক'দিন ফুর্তি করে খেয়ে নিই। আলু ভাতে ভাত খেয়ে

ঘেন্না ধরে গেল। আজ রাত্তিরেই দু'টাকার রসগোল্লা খাবো—তুই এক টাকা, আমি এক টাকা।

—তাহলে তো দু'দিনেই সব টাকা যাবে ফুরিয়ে, তারপর যে ভিখিরী সেই ভিখিরী।

—তবে তুই কি করতে বলিস?

—টাকাটা কিছুতে খাটালে হয় না? অতগুলো টাকা....

—ব্যবসা করবি? দোকান দিবি? কলকাতায় এক একখানা দোকানের ভাড়া কত জানিস?

—আরে দূর, দোকান কেন, ফিরি করলে কেমন হয়?

—তা মন্দ নয়। ইস্কুলে ইস্কুলে লজঞ্চুস ফিরি করলে বেশ হয়।

হাবু হেসে ফেললো, বললে—আর মাঝে মাঝে দু-একটা করে মুখে ফেললে দোকান চলবে ভালো, অনেক লাভ হবে!

তাহলে কি ফিরি করা যায় তাই নিয়ে চললো আলোচনা।

বিকালের দিকে দু'জনে গেল ছোট একটি গেঞ্জির কলে।

ছাব্বিশ টাকার গেঞ্জি কিনলে সেখান থেকে। কলের মালিক লোকটি ভালো, বললো—দেখ্ পাড়ায় পাড়ায় ফিরি করিসনে; অনেক গোলমাল হবে। তোরা ছেলেমানুষ, শিয়ালদার ধারে গিয়ে বস্‌গে যা, সুবিধে হবে।

শিয়ালদায় সারাদিনই লোক গিস্‌গিস্ করে। ছোট ছোট ছেলের হাতে গেঞ্জি দেখে লোকে ভাবে সস্তা হবে, তা হয়ও। বাজারের আর সবার চেয়ে দু-চার পয়সা সুবিধে দেয় হাবু। লোক প্রথমে না নিলেও ঘুরে এসে হাবুর কাছ থেকেই কেনে!

উনিশটি গেঞ্জি বিক্রী হলো সন্ধ্যা নাগাদ। হাবু মনে মনে হিসাব করে দেখলো এক টাকা সাড়ে বারো আনা লাভ হয়েছে। রাজা টাকা-পয়সাগুলো পথে ফেলে গুণতে সুরু করে দিল।

এমন সময় পিছন থেকে গলা শোনা গেল—তাইত বলি, আমার বাক্স ভেঙ্গে ছোঁড়া পালালো কোথায়···

রাজা ও হাবুকে যেন ইলেকট্রিকের শক্ মারলো। বিস্ময়ের বেগটা কাটিয়ে ওঠার আগেই রাজার পিঠে এসে পড়লো জুতোর এক ঠোক্কর।

রাজা এব মুহূর্তে সামলে নিলে, চকিতে রেজগীগুলো তুলে নিয়ে তীরের মত ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল।

জগাদাও ছুটলো তার পিছনে।

রাজা ফুটপাথ থেকে সবে মাত্র পা বাড়িয়েছে এমন সময় চারিপাশে একটা রব উঠলো—গেল! গেল!!

চকিতে একখানি লরী এসে পড়লো রাজার ঘাড়ের উপর···

একটু এগিয়ে গিয়েই লরীখানি থেমে গেল, দু'পাশের জনতা ভেঙ্গে পড়লো গাড়ীটির চারিপাশে। দু'জন সৈনিক নেমে এলো, চাকার নিচে থেকে টেনে বের করলো রাজাকে: বুকের খানিকটা থেঁৎলে গেছে, গল-গল করে রক্ত বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে।

হাবু ভীড় ঠেলে ছুটে গেল, ডাকলো—রাজা! রাজা!!

সৈনিকদের একজন হাবুর মুখের পানে তাকিয়ে বললো—ডেড!

হাবু কথাটা বুঝলো, বললো—ডেড্! মরে গেছে? য়ঁ্যা?

একজন সৈনিক জিজ্ঞাসা করলো—টোমহারে বাইয়া?

রাজার দেহটার পানে তাকিয়ে হাবু তখন পাথর হয়ে গেছে, সৈনিকের কথাটা সে শুনতে পেলে কিনা তা বোঝা গেল না।

সৈনিকটি পকেট-বুকের ভিতর থেকে একখানি দশটাকার নোট বের করে হাবুর মুঠার মধ্যে মাথা গুঁজে দিলে। অপর সৈনিকটিও তার দেখাদেখি আর একখানা নোট গুঁজে দিলে হাবুর হাতে।

ইতিমধ্যে পুলিশ এসে পড়লো, লরীখানি চলে গেল।

হাবু তখনও পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল রাজার পানে তাকিয়ে।

হঠাৎ তাঁর কাঁধে হাত পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হলো—তেরা ভাইয়া হৈ ন?

হাবু চমকে উঠলো, মুখ তুলেই দেখে—লাল পাগড়ী। ভয়ে তার সারা দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠলো। চকিতে হাতখানা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গুল্‌তির গুলির মত সে ছিট্‌কে পড়লো ভিড়ের ভিতর।

পাহারাওলার বিস্ময় যখন ভাঙলো হাবু তখন অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

অনেকটা পথ ছুটে এসে হাবু যখন দেখলো কেউ তাকে অনুসরণ করছে না তখন ফুটপাথের এক পাশে বসে সে হাঁপাতে লাগলো। হাবুর চোখের সামনে ভেসে উঠলো বাপ-মায়ের কথা, জগাদার কথা, রাজার কথা। রাজার রক্তাক্ত মুখখানি হাবু কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারলো না। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা আর তার মনে রইলো না। কোন এক সময় পাশের বাড়ীর রোয়াকের উপর উঠে সে শুয়ে পড়লো। তারপর কোন্ দিক দিয়ে যে রাত কেটে গেল তা সে টের পেলে না।

সকালে মুখ হাত ধুয়ে হাবু আবার পথে বেরিয়ে পড়লো, ঠিক করলো গোটা কুড়ি টাকা যখন আছে তখন সে আবার একটা কিছু করবে। তবে গেঞ্জির কারবার সে আর করবে না, কালকে যে কাণ্ডটা হোল···কিন্তু কি করবে—সেই কথাটাই ভাবতে ভাবতে হাবু পথ চললো।

একটা খাবারের দোকানে কচুরী জিলিপি ভাজছে, হাবু ভিতরে ঢুকে পড়লো, বললো—দাও দু'আনার কচুরী আর দু'আনার জিলিপি।

ভিতরে চেয়ার-টেবিল পাতা। দোকানী চমকে উঠলো—নাব্, নাব্, বাইরে যা, ভিতরে কেন?

—খাবো যে।

—তুই ভিতরে বসে খাবি নাকি? তাহলে পাঁচজন ভদ্রলোক দোকানে আসবে কেন? তোর কাপড়-জামা দেখলে কেউ আর দোকানে ঢুকবে।

হাবুর মনটা বিষিয়ে গেল, বললো—পয়সা দিয়ে খাবো তবু এতো ইয়ে?

সে ছিটকে পড়লো দোকান থেকে।

তারপর পথের হু'পাশে চোখ রেখে সে এগুলো। একটা ছোটখাটো দোকান তাকে খুঁজে বের করতে হবে যেখানে তার মত ময়লা জামা-কাপড়-পরা একটি ছেলে খাবার খেয়ে এক গ্লাস জল খেতে পারে।

পথের এক জায়গায় বেশ ভীড় জমেছে। হাবুর কৌতূহল হোল, তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো ভীড়ের একপাশে: একটি বছর ষোলর মুসলমান ছেলে ম্যাজিক দেখাচ্ছে। রাস্তার উপর সে পেতে বসেছে একটি মড়ার মাথা, একটি টিনের বাক্সের উপর একটি আলুর পুতুল, সামনে ছড়ানো এক জোড়া তাস। এক পাশে একটি লোক শুয়ে আছে, একখানি বড় রুমাল দিয়ে তার মুখখানি ঢাকা। ম্যাজিকওলা সাড়ম্বরে সেই জনতাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, সে ওই লোকটিকে সম্মোহিত করছে, যা-কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে সব কিছুরই সেই সম্মোহিত লোকটি উত্তর দিয়ে যাবে স্বচ্ছন্দে। জনতার যে-কেউ প্রশ্ন করে দেখতে পারে।

একজন যুবক একটু হেসে এগিয়ে এলো, বললো—আচ্ছা, বলুক তো আমার পকেটে কি আছে?

ম্যাজিকওলা সাড়ম্বরে চীৎকার করে উঠলো—বাবুজী, আপ শুনতে হেঁ?

রুমালের নিচে থেকে উত্তর এলো—হ্যাঁ।

—এই বাবুজীকা পকেটমে ক্যা হ্যায়?

—কৌন পকেটমে ?

—এই ডাহিনা পকেটমে ?

—এক রংগীন রুমাল, একঠো চাবী, ঔর এক মণিব্যাগ।

ম্যাজিকওলা বললে—ঠিক হুয়া বাবুজী ? দেখিয়ে—দেখাইয়ে।

যুবক পকেট থেকে রুমাল, চাবী আর মণিব্যাগ বের করে দেখালো।

ম্যাজিকওলা হাঁক দিল—ঔর কোই বাবু কুছ্ পুছেঙ্গে ?

হাবুর ভারী ইচ্ছা হোল, এক পা এগিয়ে গিয়ে বললো—আমি জিজ্ঞেস করবো ?

হাবুর বেশভূষার পানে একবার তাচ্ছিল্যভাবে তাকিয়ে ম্যাজিকওলা বললো—ক্যা পুছোগে রে ?

হাবু ভয়ে ভয়ে বললো—আমার কাছে ক' পয়সা আছে দেখি ও বলতে পারে কিনা ?

ম্যাজিকওলা আবার হাঁক দিল—বাবুজী, শুনতে হেঁ ? বাচ্চুকে পাশ কেৎনা হ্যায় বোল দিজিয়ে।

—পয়সা নেহি হ্যায়, নোট হ্যায়।

—কয়ঠো নোট ? কয় রূপেয়াকে ?

—দো নোট, দশ রূপেয়াকে।

হাবুকে কিছু বলার আগেই হাবু খুসি মনে বলে উঠলো—ঠিক বলেছে।

ইতিমধ্যে একজন পুলিশ এসে দাঁড়ালো, হুম্‌কি দিল—এই হট হিঁয়াসে, জলদি ··সার্জেন আতা হ্যায়···

আর কিছু বলতে হলো না। চটপট ঝোলাঝুলি গুটিয়ে ম্যাজিকওলা অচেতন লোকটির চেতনা সম্পাদনে তৎপর হোল। হাবু হয়তো আরো কিছুক্ষণ খেলা দেখতো; আবার তার পথ চলা সুরু হোল।

এলোমেলো ভাবে হাবু ঘুরছে,—এ-পথ, সে-পথ, এ-গলি,

সে-গলি—লক্ষ্যহীন। একটি লোক যে তার পিছু নিয়েছে তা সে লক্ষ্যই করেনি। একটি গলির মধ্যে ঢুকেছে এমন সময় পিছন থেকে ডাক পড়লো—এ—য় শোন্।

—আমাকে ডাকছেন ?

—হ্যাঁ, শোন ইদিকে।

হাবু কাছে আসতেই লোকটি তার একখানি হাত চেপে ধরলো, বললো—বের কর্ কোথায় রেখেছিস টাকা।

হাবু তো থ'।

—বের কর্।

—কী ?

—টাকা। টাকা॥ দশ টাকার নোট দু'খানা।

—কেন ?

—কেন আবার কি ? ভাল চাস্ তো বের কর। না হলে তোকে ঠেঙিয়ে সিধে করবো।

হাবু এবার মরিয়া হয়ে উঠলো, বললো—আমি রাস্তার লোক ডাকবো।

—ডাক্না রাস্তার লোক, বেটা চোর কাঁহাকা।

ইতিমধ্যে তার চেঁচামেচিতে দু-চার জন পথিক দাঁড়িয়ে গেল, তাদের শুনিয়ে লোকটি বললো—কি বলব মশাই, তিনদিন চাকর রেখেছি আর আজ সকালেই আমার পকেট থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট নিয়ে উধাও। ছোঁড়ার নিকুচি করেছে।—বলেই এক চড় বসিয়ে দিলে হাবুর গালে।

হাবুও এবার রুখে উঠলো—আমি তোমার বাড়ী চাকরী করি ? এ টাকা তোমার ?

—আমার টাকা নয় তো কি তোর বাবার টাকা ? ব্যাটা খেতে পাচ্ছিলি না, বাড়ীতে কাজ দিলুম। এখন কিনা আমারই উপর চোখ রাঙানো।

আরেক চড় পড়লো হাবুর গালে।

একজন বুড়ো লোক এগিয়ে এসে বললো—মার-ধোর বেশী করে কি হবে? থানায় নিয়ে যাও।

—অতো পুলিশ-টুলিশের হাঙ্গামা করার মত সময় আমার নেই মশাই। সকাল ন'টায় বেরোই আর রাত ন'টায় বাড়ী ফিরি। এখন টাকা ক'টা উদ্ধার হলেই বাঁচি!

ছেলে-ছোকরার দল বলে উঠলো—ঘা কতক আচ্ছা করে দিয়ে দিন না মশাই, এখনি ঠিক হয়ে যাবে!

বুড়ো লোকটি বললো—যাক গে, আর মেরে-ধরে দরকার নেই। ছেলেমানুষ লোভের বশে একটা কাজ করে ফেলেছে। তা তুই টাকাগুলো ভালোমানুষের মত বের করে দে-না বাপু, আর ঘাঁটিয়ে দরকার কি?

কিন্তু হাবুকে আর কিছুই বলতে-কইতে হোল না, চড় দু'খানির ওজন বড় কম ছিল না, তার কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছিল। লোকটি ততক্ষণে হাবুর কোমরে জড়ানো কাপড়ের খাঁজ থেকে নোট দু'খানি বের করে সবাইকার চোখের সামনে তুলে ধরলো, বললো —দেখলেন? এই দেখুন।

হাবুর গালে আরেক চড় বসিয়ে দিয়ে লোকটি ভীড়কে পাশ কাটালো। হাবু তাড়াতাড়ি লোকটির জামার একটা খুঁট চেপে ধরার চেষ্টা করলো, কিন্তু ঠিক সেই সময় বছর দশেকের একটি ছেলে এসে হাবুকে মারলো এক ধাক্কা—ব্যাটা চোর!

কাল রাত থেকে খাওয়া হয়নি, তার উপর এই মার, হাবু আর সামলাতে পারলো না, পড়ে গেল। বাড়ীর দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল। সবাই বললো—ঠিক হয়েছে! এতটুকু ছেলে এমন চোর, ব্যাটাকে আচ্ছা করে ঘা-কতক কষিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে জীবনে আর কখনও চুরী না করে!

আরো হয়তো ঘা কতক পড়তো হাবুর পিঠে, বুড়ো লোকটি

সকলকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌লো—থাক্‌ থাক্‌, অনেক হয়েছে। কপালটা কেটে গেছে দেখেছ। পুলিশ এসে পড়লে তোমাদেরকেও টেনে নিয়ে যাবে এই সঙ্গে। নে নে ছোকরা ওঠ্‌, ওই কলে গিয়ে কপালে একটু জল দিগে যা—

হাবু ততক্ষণে উঠে বসেছে, কপালটা যে কেটে গেছে তা সে টের পায় নি, একবার হাত বুলিয়ে দেখলে হাতে রক্ত। কাপড়ের খুঁটে হাতখানি মুছে ফেললো। তারপর দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইলো সেইখানে।

বুড়ো বললো—নে ওঠ্‌, একটু জল দিগে যা—

হাবু একবার তাচ্ছিল্যভরে তার মুখের পানে তাকিয়ে দেখলো, কিন্তু উঠলো না। গাল বেয়ে রক্ত নেমে এলো চিবুকের নিচে।

দুই

হাবুর চাকরী হয়ে গেল।

বেকার হাবু এক বাড়ীর রোয়াকে বসে নানা কথা ভাবছিল, এমন সময় একখানি চেনা মুখ চোখে পড়লো, ছুটে গিয়ে বললো— স্যার, আমাকে চিনতে পারছেন?

লোকটি হাবুর মুখের পানে তাকালো।

হাবু বললো—আপনি আমাকে বাঁচিয়ে ছিলেন মেদিনীপুরে। কাঁথীতে আপনাদের আশ্রমে কতদিন আমাকে রেখেছিলেন···

ব্রহ্মচারী বললেন—ও:, তা হবে। কতদিন হয়ে গেল— তোদের আমি সব ভুলেই গেছি, তা এখানে এলি কেমন করে?

—হেঁটে। সতেরো দিন লেগেছিল। সবাই বললে 'কলকাতায় খেতে পাবে', তাই চলে এলাম।

—কি করছিস এখানে?

—কিছুই না। চোরবাগানে মল্লিকবাড়ী খাই আর ফুটপাতে পড়ে থাকি।

তারপর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে একপা একপা করে এগুতে এগুতে হাবু অনেক কথাই বললো। সে ভেবেছিল এখানে এলে অনেক কিছু সুবিধা হবে, কিন্তু এখন চাট্টি খেতে পেলেই সে নিজেকে ধন্য মনে করে....ইত্যাদি....

ব্রহ্মচারী বললেন—কাজ করবি? চাকরী?

তারপর হাবুকে এনে পরিচয় করিয়ে দিলেন এক বিড়ির দোকানে।

হাবুর দিন চারেক লাগলো শিখতে।

এক হাজার বিড়ি পাকাতে সময় লাগে সকাল থেকে সন্ধ্যা

পর্যন্ত। পিঠ টন টন করে ওঠে, কনুই আর কাঁধ ঝিম্ ঝিম্ করে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা বারো আনা পয়সা পাওয়া যাবে, সেইজন্যই হাবু শরীরের দিকে আর ভ্রূক্ষেপ করে না।

হাজার বিড়ি হলেই হাবু আর বসে না, বারো আনা পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে এলো মেলো ভাবে পথে ঘুরে বেড়ায়।

কাছেই একটা সিনেমা আছে, তার সামনে একজন চিনাবাদামওলা পথের উপরেই বসে বসে বাদাম ভাজে। তার কাছ থেকে হাবু নিত্য দু' পয়সা বাদামভাজা কেনে। তারপর তার মুখ চলতে সুরু করে। যতক্ষণ বাদামগুলো না শেষ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে থাকে সিনেমার সামনে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে : ওটা যেন একটা স্বপ্ন-রাজ্য। কত আলো জ্বলছে, কত ছবি সাজানো। পালা ভাঙলে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ বেরিয়ে আসে, কেমন সুন্দর তাদের কাপড় জামা, ছবির মত তাদের সাজগোজ। তারা পাশ দিয়ে চলে গেলে নিজের ছেঁড়া কাপড়ের জন্য হাবুর লজ্জা করে। সে মনে মনে ঠিক করে কিছু পয়সা জমিয়ে সে-ও অমনি জামা-কাপড় পরবে, বায়োস্কোপও দেখবে মাঝে মাঝে।

ভাবতে ভাবতে চিনাবাদামগুলো ফুরিয়ে যায়, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাবু আবার বিড়ির দোকানের পথ ধরে।

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও হাবু পথে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ একটা সোরগোল উঠলো—চোর চোর! টিকিট ঘরের সামনে একটি ছেলেকে ধরে একটি লোক প্রহার করতে সুরু করে দিলে। দেখতে দেখতে চারিপাশে ভীড় জমে উঠলো।

হাবুও ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো। চোরের মুখখানি দেখেই হাবু চমকে উঠলো : এ যে তাদের জীবন। জীবন তো চুরী করার মত ছেলে নয়, তবে ?

ইতিমধ্যে কার এক ঘুসি খেয়ে জীবনের ঠোঁট কেটে গেল.

মুখখানি রক্তাক্ত হয়ে উঠলো—রক্ত দেখেই হাবুর মাথায় খুন চড়ে গেল, সে চীৎকার করে উঠলো—কেন তোমরা শুধু শুধু ওকে মারছ, ও চুরী করেনি।

—তাই নাকি রে!

ঠাস্ করে এক যুবক হাবুর গালেই এক চড় বসিয়ে দিলে।

হাবুও তাকে মারলো এক ধাক্কা, তাছাড়া সামনে যাকে পেল তাকেই ধাক্কা মেরে সরাতে লাগলো, তার সঙ্গে চীৎকারও চললো—তোমরা একে খুন করবে নাকি? চুরী করেছে। বেশ করেছে, তাবলে রক্তারক্তি করবে? পুলিশ! পুলিশ!!

চোরেরাই পুলিশ ডাকে দেখে প্রহারকদের উৎসাহ কমে গেল। তার উপর হাবুর চীৎকার সবাইকে থম্‌কে দিলে—

পুলিশ! পুলিশ! এরা আমাদের খুন করলো! মেরে ফেললো! খুন! খুন!

সার্জেন্ট মোটর-বাইকে ছুটছিল, চীৎকার শুনে বাইক ফেরালো ভীড়ের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে ভীড় ফাঁক হয়ে গেল, বাইক এসে রুখলো একেবারে হাবুর সামনে, সাহেব জিজ্ঞাসা করলো—কেয়া হুয়া?

কে একজন বলে উঠলো—চোর স্যার, পিক্‌পকেট!

হাবুও চীৎকার করে উঠলো—নো স্যার নট্ পিক্‌পকেট। ফর নাথিং বীটিং···কিলিং···মারডারিং·· সী ব্লাড···

হাবু যেমন ইংরাজী জানে, অনর্গলভাবে তাই বলতে লাগলো।

সার্জেন্ট কি বুঝলো কে জানে। জীবন ও হাবুর পানে একবার তাকিয়ে নিয়ে জনতার পানে রুখে উঠলো—হল্লা মত করো—হটো—

ভীড় ফাঁক হয়ে গেল, হাবু জীবনের হাত ধরে বললো—নে-চল্—।

একটু এগিয়ে এসে রাস্তার কলে মুখ হাত ধুয়ে জীবন বললো—যাক, আজ তোর জন্যেই বেঁচে গেলাম, নাহলে পিঠে আর চামড়া থাকত না।

হাবু জিজ্ঞেস করলো—তুই সত্যি চুরী করেছিলি?

—চুরী নয়, পকেট মেরেছিলাম।

—তুই পকেট মেরেছিলি?

—কেন, কি হয়েছে?

—তুই ফার্স্ট বয়, ভালো ছেলে, ইস্কুলে কখনও তুই মিছে কথা বলতিস্ না।

—তখন তো খাবার ভাবনা ছিল না, তাই রূপকথার রাজ্যের মানুষ ছিলুম। কিন্তু ঝড়ের পরে যেদিন দেখলুম আপনার জন আর কেউ নেই, আর এই কলকাতা সহরে চরে খেতে হবে, তখন একদম প্র্যাক্টিক্যাল মানুষ বনে গেলাম। এখানে এসে দেখি যেটুকু বিদ্যে জানি তাতে লোকের বাড়ী চাকর হওয়া ছাড়া আর কিছুই হওয়া যায় না। জোয়ান ছেলে বলে ভিক্ষেও কেউ দেয় না। অথচ পেট চালাতে গেলে টাকার দরকার। কলকাতার মত শহরে তাড়াতাড়ি ইচ্ছামত টাকা পাবার সহজ উপায় হচ্ছে পকেট কাটা, এক আড্ডায় ভর্তি হয়ে তাইতেই হাত পাকাতে সুরু করলাম। তবে হাতখানা এখনও ঠিক তৈরী হয়নি, তাই ধরা পড়ে গেছি।

জীবন পকেট থেকে একটি মনিব্যাগ বের করে হাবুকে দেখালো, বললো—ব্যাটারা, ধরে খুব পিটছিল, যে-ব্যাটা ঠোঁট ফাটিয়ে দিয়েছে তারই পকেট থেকে সাফ্ করে দিয়েছি। এতক্ষণে পকেটে হাত দিয়ে ব্যাটার চক্ষুস্থির হয়ে গেছে। দেখি কত হোল।

জীবন গুণে দেখলে চার টাকা সাড়ে ছ'আনা। বললো—এ কি জানিস তো? ন্যায় বিচার: 'কাঁথি ইস্কুলের নবম শ্রেণীর ফার্স্ট বয় জীবন সরকারকে প্রহার করার অপরাধে শ্রীযুক্ত ভদ্রলোকের চার

টাকা সাড়ে ছ'আনা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানার টাকা জীবন সরকারকে দিয়া দিবার আদেশ হয়—।'

হাবু তো থ', জীবন কি ছেলে ছিল আর আজ কি হয়েছে!

জীবন বললো—হাঁ করে যেভাবে তুই আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছিস—বুঝতে পেরেছি তোর ক্ষিদে পেয়েছে, চল তোকে কিছু খাইয়ে দি গে—।

হাবুর হাত ধরে জীবন এক রেস্টুরেণ্টে এসে ঢুকলো।

নিজেও খেলে, হাবুকেও খাওয়ালে।

বিল হোল তিন টাকা।

খেতে খেতে জীবন বললো—তুই তো রোজ পাস বারো আনা, তার মধ্যে আবার জমাচ্ছিস চার আনা। না খেয়ে শেষে তোর টি-বি হবে, দেখিস?

—না জমালে বই কিনবো কোত্থেকে?

—বই কিনে কি হবে? কি হবে পড়াশুনা করে? চার-পাঁচটা পাস করে কত ছেলে ত্রিশ টাকা মাইনের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা জানিস্? তার চেয়ে আমাদের এই ব্যবসাই ঢের ভালো। আমি তো এই দু'মাসের মধ্যে ব্যাংকে বারোশো টাকা জমিয়েছি।···

—তারপর যেদিন জেল হবে?

—যদি হয়, হবে, সেজন্য মোটেই ভাবিনে। জেল থেকে এসে মোটর কিনবো। না হলে তো লোকের বাড়ীতে চাকরের কাজ নিতে হোত—বাসন মাজা, জুতো ঝাড়া, তেল মাখানো—জেলখানারও অধম। মরবার সময়টুকু ছাড়া নিঃশ্বাস ফেলার ছুটি নেই।

রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে জীবন হাবুকে অনেক কথাই বোঝায়, বললে—তুইও চল, কলকাতায় ভদ্রভাবে বাঁচতে হলে টাকা চাই, বিড়ি পাকিয়ে বারো আনা রোজ নিয়ে কোন্ দুঃখ ঘুচবে?

একখানা কাপড় আর একটা জামা কিনতেই তো দশ টাকা লাগে।

হাবু বললো—না, সে আমি পারবো না।

কথা বলতে বলতে হাবুদের দোকানের সামনে এসে দু'জনে দাঁড়ালো। পথের তে-মাথার মোড়ে ছোট একখানি ঘরে দোকান, মাঝে কাঠের তক্তা মেরে ঘরখানিকে দোতলা করা হয়েছে, নিচের তলায় বসে দু'জন লোক বিড়ি পাকাচ্ছে, উপর তলায় দোকান বসেছে।

দোকানী হাবুকে দেখে বললো—বসতো হাবু একটু, আমি এখনি আসছি—

হাবু দোকানে উঠে বসলো, জীবনকে বসালো পাশে।

জীবন বললো—তুই কি এখানেই থাকিস না কি?

—এখানে জায়গা কই, ওই পাশের রোয়াকটায় শুয়ে থাকি।

—শীত করে না?

—অভ্যাস হয়ে গেছে।

জীবনের চোখে করুণা ফুটে উঠলো। শীতের রাত্রে একটা পাতলা সুতির গেঞ্জি গায়ে দিয়ে সারা রাত হাবু ফাঁকায় পড়ে থাকে, বললো—তুই চল আমার সঙ্গে, অনেক সুখে থাকবি।

—না ভাই, আমি ওই পকেট মারতে পারবো না।

—চুপ! কেউ শুনলে কি ভাববে।

কথাবার্তার ফাঁকে দোকানী এসে পড়লো, জীবন বললো—আচ্ছা, আমি আজ যাই—

হাবু বললো—চল্ তোকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

শ'খানেক গজ গেছে, এমন সময় পেছন থেকে ডাক পড়লো.—হাবু, এই হাবু—

হাবু ফিরলো।

দোকানী বললে—এখানে যে ড্রয়ারের মধ্যে ছ'টা টাকা ছিল, কোথায় গেল?

—তাতো জানি না।

—জানিস নে মানে? টাকাগুলো এই মাত্র রেখে উঠে গেলাম আর এখনি উবে গেল?

—দেখ, হয়তো আর কোথাও রেখেছ।

—দেখেছি। তোর সেই বন্ধুটি কোথায় গেল?

দপ্ করে একটা কথা হাবুর মনে উঠলো। তবে কি জীবন টাকাটা সরিয়েছে? বললো—দাঁড়াও দেখছি—

হাবু ছুটে যাবার উপক্রম করতেই দোকানী তার একখানি হাত চেপে ধরলো, বললো—পালাচ্ছিস্ কোথায়? দেখি তোর ট্যাঁক?

হাবুকে কিছু বলার অবসর না দিয়ে দোকানী তার কাপড়ের খুঁটে বাঁধা তিনটি টাকা বের করে নিয়ে বললো—আর তিন টাকা কি করলি?

হাবু তার হাত থেকে টাকাগুলো ছিনিয়ে নিতেপারবে না জেনে অসহায়ভাবে বললো—ও তো আমার টাকা, বারেঃ!

—তোর টাকা?—ঠাস্ করে হাবুর গালে এসে পড়লো এক চড়।

তবু হাবু জোর গলায় বললো—ওতো আমারি টাকা, রোজ চার আনা করে যে জমাই। বারো দিনে—

—দেখ্ ছোঁড়া—দোকানী বললো—মেরে আমি তোর হাড় ভেঙে দোব। যদি ভালো চাস্ তো বাকি টাকা তিনটে দিয়ে দে?

—সত্যি বলছি, তোমার টাকার কথা আমি জানি না, ওগুলো আমার টাকা।

যে দু'জন নিচের তলে বিড়ি পাকাচ্ছিল তাদের একজন এবার বেরিয়ে এলো, বললে—দে-না ঘাকতক, সব ঠিক হয়ে যাবে···ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে তুই কি সব টাকাকড়ির কথা বলছিলি না?

এবার সত্যই হাবু বিহ্বল হয়ে পড়লো।

—কি রে ছোঁড়া চুপ করে রইলি যে?

পড়লো পরপর দুই চাঁটি।

হাবু কেঁদে ফেললো।

—চোখের জল ঢের দেখেছি, টাকা কি করলি, বল্?

—নিইনি।

—নিস্‌নি তো ছ'টা টাকা উবে গেল, ন্যা। টাকা তোর কাছ থেকে বেরোয় কিনা দেখছি—

প্রহার স্থরু হলো রীতিমতো।

ঘা-কতক খেয়ে একটু ফাঁক পেয়েই হাবু ছুট দিল পথের উপর দিয়ে।

আলো সঙ্কুচিত অন্ধকার পথে অনেকটা ছুটে গিয়েও হাবুর মনে হোল তখনও কে একজন তার পিছনে আসছে। আবার কোন পথে ছুটবে ভাবছে, এমন সময় পিছন থেকে ডাক শুনলো—হাবু! হাবু!!

জীবনের গলা।

হাবু থামলো।

কাছে এসে জীবন বললো—এতো ডাকছি শুনতে পাচ্ছিসনে, মার খেয়ে তোর কানে তালা লাগলো নাকি? ··এই নে, টাকা ক'টা তোকে দিয়ে যাবার জন্য দাঁড়িয়েছিলুম!

ছ'টাকার ছ'খানি নোট জীবন এগিয়ে দিলে।

—তুই নিয়েছিলি টাকা।

—তোকে দেখালুম কত সহজে আমরা টাকা উপায় করি। আয় আমাদের দলে···

হাবুর মনের মাঝে রি রি করে উঠলো, বললো—না, ওই টাকা তোর কাছে থাক্। আমার চাইনে, ও তোর উপায়ের টাকা!

জীবন তার হাতে টাকাটা গুঁজে দিতে গেল, হাবু ছিট্‌কে গেল, বললো—চোরের টাকা আমি নিইনে—

জীবন হেসে বললো—না নিস্ থাক আমার কাছে।

হাবু চললো, জীবনও চললো তার পাশে পাশে।

হাবু বললো—তুই আমার সঙ্গে যাচ্ছিস্ কোথা?

—যেখানে আমার খুসি।

আবার খানিকটা যাবার পর জীবন বললো—টাকাগুলো দোকানে ফেরৎ দিয়ে এলে পারতিস্!

হাবু ফিরে দাঁড়ালো, বললো—দে, তাই দিয়ে আসি—

জীবন হাসতে হাসতে বললো—মারগুলোও ফেরৎ নিয়ে আসিস্ কিন্তু!

হাবু গম্ভীর হয়ে আবার চলতে সুরু করলো।

আবার কিছুদূর যাবার পর জীবন বললো—কাল থেকে খাওয়া-দাওয়ার কি করবি? হাতে তো একটি পয়সা নেই।

—সে আমি বুঝবো।

—রাজেন্দ্র মল্লিকের অন্নছত্তর?

হাবু এবার ঘুরে দাঁড়ালো, বললো—দেখ্ জীবন, তুই আমাকে রাগাস্ না বলছি—

—বা রেঃ! কাল কি খাবি জিজ্ঞেস করলুম আর তাতেই দোষ হোল?

—আমি যাই খাই, তোর কি?

—এই টাকা ছ'টা রেখে দে।

জীবন নোট ছ'খানা হাবুর হাতে গুঁজে দিলে। হাবুর ইচ্ছা হোল নোটগুলো ফেলে দেয়। কিন্তু জীবন ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে, নেহাৎ টাকাগুলো পথে ফেলে দেওয়ার কোন মানে হয় না। তাছাড়া টাকার একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, কর্‌করে নোটগুলো হাতে পেয়ে ফেলে দিতেও ইচ্ছা করে না।

কিছুক্ষণ হাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তাকিয়ে রইল অন্ধকারের পানে—যেদিকে জীবন চলে গেল। তারপর কি ভেবে নোট ছ'খানা কোমরে-বাঁধা কাপড়ের খাঁজে গুঁজে ফেললো।

আবার সুরু হোল পথ চলা।

তিন

হোটেল থেকে দু'জন যুবক পথে নামতেই হাবু এসে হাত পাতলে—দু'টো পয়সা দেবেন? আজ সারাদিন কিছু খাই নি—

—একটা পয়সা পাস্‌না, আবার দু'পয়সা!

আরেকজন বললো—এ বাজারে দুটো পয়সা এম্‌নি সোজা কথা, না?

—আমি সকাল থেকে কিছুই খাইনি বাবু—ভিখারী ছেলেটি মলিন মুখে যুবক দু'জনের পানে তাকালো।

—সকাল থেকে খাস্‌নি সে কি আমার দোষ, পয়সা রোজগার কর্, তাহ'লেই খেতে পাবি!

যুবক দু'জন পাশ কাটিয়ে আগিয়ে গেল, তাদের সার্টের হাতার ফাঁকে হাতঘড়ি আলোয় ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো। তাদেরই পিছনে ক্ষুধার জ্বালায় হতাশ দৃষ্টিতে কম-বয়সী একটি ছেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সহসা কোথা হতে একখানা মোটর এসে পড়লো একেবারে হাবুর ঘাড়ের উপর। বড় লোকের ছেলে সোফারকে পাশে বসিয়ে সখ করে মোটার চালাতে শিখছিল, সহসা সাম্‌লিয়ে ওঠা তার পক্ষে মুস্কিল হোল। ভিখারী ছেলেটী চাপাই পড়ত, ছুটে পালাতে গিয়ে বেঁচে গেল। বাঁচল বটে, কিন্তু ধাক্কা লেগে পথে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি আরোহী নেমে এসে হাবুকে হাতে ধরে তুললো। মোটারের মধ্যে তুলে সোফারকে বললে—মেডিক্যাল কলেজ!

পথে মোটারের চারিপাশে তখন দু'একটি করে লোক জমছে, পুলিশ আসবার আগেই মোটার ছেড়ে দিল।

হাবুর কিছুই হয়নি, হাঁটুটা একটু ছড়ে গিয়েছিল মাত্র।

আরোহী ছেলেটী বললো—কিছুই যখন হয়নি তখন আ
হাসপাতালে গিয়ে কি হবে, চলো, তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিে
আসি।

—বাড়ী তো আমার নেই।

—বাড়ী নেই! তবে রাত্রিতে থাকো কোথায়?

—আজ্ঞে, রাত্তিরে ফুটপাতে যেখানে-সেখানে পড়ে থাকি।

—বেশ তবে চলো, আজ আমার বাড়ীতেই চলো—

শীতের সন্ধ্যায় মোটর হু হু করে ছুটছে। হাবু এর আগে
জীবনে কখনও মোটর চড়েনি। ভিতরে একপাশে কোন রকমে
জড়-সড় হয়ে বসেছিল, মনে হচ্ছিল ধূলায়িত কাপড়-জামার স্পর্শে
মোটরের গদীটা বুঝি এখনই ময়লা হয়ে যাবে। তার উপর পৌষ
মাসের দমকা হাওয়া তার ছেঁড়া সার্ট ভেদ করে গায়ে যেন ছুঁচ
বেঁধাচ্ছিল।

ছেলেটি সহসা বললো—কাঁপছো কেন, শীত করছে বুঝি!
বেশ, এই নাও আমার এই শালখানা গায়ে দিয়ে বসো।

হাবুর ছেঁড়া কাপড়-জামার উপর ছেলেটী নিজের গলায়
জড়ানো দামী শালখানি জড়িয়ে দিল, তাতে হাবু যেন আরও
আড়ষ্ট ও বিব্রত হয়ে উঠলো। তবে গরম পেয়ে এবার সে
আরাম পেল যেন, মনটা তার কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো।

মোটর একটি বাড়ীর সামনে আসতেই ছেলেটী হাবুর হাত ধরে
বরাবর একেবারে দোতলায় এসে উঠলো। ইলেক্‌ট্রিকের
আলোয় নীলাভ একটি ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রকাণ্ড সোফার উপর
বসে পড়ে ডাকলো,—হরি!

—আজ্ঞে বলুন—একটি চাকর এসে দাঁড়ালো।

—দু'জনের খাবার নিয়ে আয়, আমরা দু'জনে খাব।

—দু'জনের!

এই ছেঁড়া কাপড়-জামা পরনে, এক-পা ধূলো মাখা ভিখারীর মত ছেলেটী দাদাবাবুর সঙ্গে খাবে, হরি যেন একথা বিশ্বাস করতে পারলো না।

—হ্যাঁ, হু'জনের···দেখতে পাচ্ছিস্ না, হু'জনে রয়েছি।

সহসা হাবুর পানে চোখ পড়তেই বললো,—এখনও দাঁড়িয়ে আছ যে, বসো, বসো,—হাবুর হাত ধরে ছেলেটি তাকে নিজের পাশে সোফার উপর বসালো।

খাবার এলো। এমন সুস্বাদু রকমারি খাবার হাবু জীবনে কখনও খায়নি। তার উপর চাকরটি সামনে দাঁড়িয়ে এমনভাবে তাকাচ্ছে যে বেচারা ভাল করে খেতেও পারলো না। ছেলেটীর খাওয়া এদিকে শেষ হয়ে এলো, হাবুকে জিজ্ঞাসা করলো,—কি হে পেট ভরেছে, না আর কিছু খাবে ?

হাবুর ইচ্ছা হোল ছুটি সন্দেশ চায়, কিন্তু চাকরটার সামনে মুখ ফুটে চাইতে পারলে না। বললো—হ্যাঁ খেয়েছি।

—তোমার বাড়ী ঘর নেই বললে না, তা থেকে যাও না এখানে, আমাদের বাড়ীতে ?

—তা থাক্‌বে না, কোথাকার কোন্ লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! যা যা বেরো, এখান থেকে—ঘরের মধ্যে যেন বোমা ফাটলো।

হাবু চমকে উঠে চেয়ে দেখলো, আধাবয়সী এক বিধবা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কি, অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস্ কিরে ছোঁড়া, যা যা বেরো এ বাড়ী থেকে, তোরা পাঁচজনে মিলেই ছেলেটার মাথা খেলি—ওঠ্ যা—

হাবু ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি সে উঠে দাঁড়ালো। দরজার কাছে আসতেই মহিলাটি একটানে হাবুর গা থেকে দামী শালখানা খুলে নিলে, বললো—লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া মরার আর জায়গা পাস্‌নি, বেরো এ বাড়ী থেকে—

হাবু ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল। শীতের রাত্রির কন্‌কনে ঠাণ্ডায় নিরাশ্রয় হাবু কোথায় যাবে কিছুই ঠিক করতে পারলো না। পথে দাঁড়িয়ে ভাবছে, সহসা ছেলেটী কোথা হতে এসে হাবুর হাতে

একটুকরা কাগজ গুঁজে দিয়ে বললো—এই নাও ভাই, কিছু মনে করো না।

ছেলেটি ছুটে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। কাগজখানি খুলে হাবু দেখলো একখানি দশটাকার নোট। হাবু প্রথমটা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু বিশ্বাস না করারও কোন কথা নয়, অনেকক্ষণ ভাল করে দেখে কাপড়ের খুঁটে হাবু নোটখানি ভাল করে বেঁধে কোমরে গুঁজলো। মনটা একেবারে বদ্‌লে গেল, দশ টাকার নোট কাছে আছে, তার ভাবনা কি। জোরে জোরে সে পথে পা চালালো।

পথের মোড়ে দম্‌কা হাওয়ায় হাবু কেঁপে উঠলো। নাঃ, এই ছেঁড়া জামাটি গায়ে দিয়ে আর আত্মরক্ষা করা যায় না। সহসা নজরে পড়লো দোকানে সারি সারি কম্বল একখানির উপর আরেকখানি সাজানো রয়েছে। ওই রকম একখানি কম্বল কিনে নিলে মন্দ হয় না তো, টাকা যখন পকেটেই আছে।

হাবু একটি ছোট দোকান দেখে ঢুকে পড়লো, বললো—একখানি লাল কম্বল কিনবো।

হাবুকে দেখে দোকানদার কথাটা বিশ্বাস করতে পারলো না, বললে—টাকা আছে?

—দশ টাকার নোট আছে।

—দেখি?

হাবু কাপড়ের খুঁট খুলে নোটখানি দেখালো।

—কোন্ কম্বল?

—লাল কম্বল।

একখানি লাল রঙের কম্বল দেখিয়ে দোকানী বললো—এই রকম?

—হ্যাঁ। কত দাম?

—তিন টাকা।

—কিছু কমবে না

—না না, সব এক দাম। নেবে তো বল?

—আচ্ছা দাও—

দোকানী কম্বল বের করে হাবুর হাতে দিল, বললো—দাও, নোট দাও?

—আগে টাকা দাও—

—নোট না দিয়েই টাকা?—দে দে শীগগীর নোট দে, এখনি দোকান বন্ধ করবো।

বাধ্য হয়ে হাবুকে নোট দিতে হোল।

বার দুয়েক ভাল করে আলোর সামনে তার নোটখানি দেখে নিয়ে দোকানী বাক্স খুলে হাবুর হাতে চার আনা পয়সা দিয়ে বললো—যা—

হাবু প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি, বললো—আর?

—আবার কি?

—বাকি টাকা?

—টাকা। টাকা কিসের?

হাবুর মাথা ঘুরে গেল, বললো—আমি দশ টাকার নোট দিলাম যে?

—দশ টাকার নোট দিলি? দশ টাকার নোট কখনও চোখে দেখেছিস্! যা—যা—

হাবুর মাথা গরম হয়ে গেল, কম্বলখানা মাটিতে ফেলে দিয়ে সে চীৎকার করে উঠলো,—দিবি না আমার টাকা, তবে রে—

দোকানীকে হাবু প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল। দোকানীই বা তা সহ্য করবে কেন? হাতের কাছে গজ মাপার শিকটা ছিল, তাতেই সে হাবুর গায়ে এক ঘা বসিয়ে দিল। মার খেয়ে হাবু তার হাত হতে শিকটা কেড়ে নিল। বেগতিক দেখে দোকানী বাহির হয়ে এসে চীৎকার জুড়ে দিল—পুলিশ, পুলিশ।

ভিড় জমে গেল। একটা পুলিশও কোথাও হতে এসে পড়লো।

দোকানী বললো—ওইটুকু ছেলের বদমাইসি বুদ্ধি কী কম! একখানা কম্বল কিনবো বলে দোকানে ঢুকে বলে, 'টাকা দেবে তো দাও, না হলে খুন করবো—'

পাহারাওলাটী দোকানের ভিতর ঢুকে হাবুকে ধরে আনলো।

সারারাত হাজতে কাটিয়ে পরদিন হাবুকে কোর্টে হাজির করা হলো।

দোকানী কাঠগড়ায় উঠে বললো—হুজুর, ছোকরা একখানি কম্বল নিয়ে আমায় বললে 'দশটাকার নোট দিয়েছি, সাত টাকা ফেরৎ পাবো।' আমি তখন তাকে দোকান থেকে চলে যেতে বললে, আমার হাতের কাছে কাপড়-মাপা গজ-শিক্‌টা ছিল, তুলে নিয়ে আমায় ঘা কয়েক বসিয়ে দিল। আমি তাড়াতাড়ি কোন রকমে বাইরে বেরিয়ে এসে পুলিশ ডাকি। একটা ছোট ছেলে যে এমন শয়তান হয়, হুজুর আগে তা জানতুম না।

সত্যি কথা বলার শপথ করে লোকে যে এমন সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যা বলতে পারে, হাবু তা জানতো না। শেষে প্রতিবাদ করে বললো—মিছে কথা বলছে হুজুর, আমি ওকে দশটাকার নোটই দিয়েছিলুম।

—দশটাকার নোট দিয়েছিলে।

—হাঁ, হুজুর।

—কোথায় পেলে ?

—একজন আমায় দেয় ?

—কে ? কি নাম ?

—নাম তো জানিনে হুজুর। কাল পথে একটা মোটর গাড়ী আমায় ধাক্কা দিয়েছিল, সেই মোটর গাড়ীর লোকটাই আমায় নোটখানি দেয়।

—মোটরের নম্বর কত ?

—তা জানিনে।

—মোটর গাড়ীর ধাক্কা লেগে তোমার চোট্ লাগেনি

—আজ্ঞে না হুজুর শুধু পথে পড়ে গিয়েছিলুম।

—হুঁ বুঝেছি। তুমি একেবারের দাগী, না ?

হাবু চুপ করে রইল, মানে বুঝলো না।

—হুঁ, সহজে শায়েস্তা হবার ছেলে তুমি নও। কান ধরে পঁচিশবার ওঠ্ বোস করো।

হাবুকে সেখানে কান ধরে পঁচিশবার ওঠা-বসা করতে হলো।

ম্যাজিস্ট্রেট এবার ধমক দিলেন—খবরদার আর কখনো এমন কাজ করবে না। বেলা পাঁচটা অবধি আটক থাকো। ফের এমন করলে জেলে দোব।

বারো বছরের একটা ছেলেকে এর চেয়ে বেশী আর শাস্তি দেওয়া চলে না। ম্যাজিস্ট্রেট ডাকলেন—তারপর নেকস্ট্ কেস ?

ম্যাজিস্ট্রেটের রায় শুনে হাবু স্তব্ধ হয়ে গেল। ভিখারীকে কেউ দশটাকার নোট দিতে পারে তা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অবিশ্বাস্য। কাজেই ন্যায় বিচারে তাকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। ভিখারী বলে একদল তাকে করবে ঘৃণা, আরেক দল করবে অত্যাচার। হাবুর ইচ্ছা হোল, ডাক ছেড়ে একবার কেঁদে ওঠে—কিন্তু তেমন কিছু করবার আগেই তাকে জেলের গাড়ীতে তুলে দেওয়া হোল।

চার

সেদিন সন্ধ্যার দিকে শীতটা একটু বেশী পড়েছিল। দেয়াল থেকে ছেঁড়া পুরু প্লাকার্ডের কাগজখানির উপর বসে বসে হাবু কাঁপছিল। এক একটা দমকা হাওয়ার মুখে ছেঁড়া জামাটা সে কোন রকমেই বাগ মানাতে পারছিল না। এই জামাটা গায়ে দিয়ে কি করে আজ রাত্রে ঘুমাবে তাই হচ্ছিল তার দুর্ভাবনা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। পিছন থেকে হন্ হন্ করে দুটী ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করলো—হাবু যাবি ?

কথা শুনে হাবু মুখ ফেরালো। দেখলো ননী ও পঞ্চু তাকে ডাকতে এসেছে, জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় ?

—মল্লিক বাড়ী থেকে আজ আড়াইশো কম্বল বিলোবে, এখ্খুনি খবর পেলুম।

হাবু বিশ্বাস করতে পারলো না। এমনি কথা বলে কতদিন তো তারা তাকে কত ঘুরিয়েছে, শেষে পেটের জ্বালায় সারা রাত ভাল করে ঘুমাতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করলো—সত্যি ? না ওই বলে আমায় খানিকটা ঘুরিয়ে আনবি ?

—বেশ, সত্যি নয় তো নয়। ফিরে যাবার সময় তোকে দেখিয়ে নিয়ে যাব'খন—বলে ননী পঞ্চুর হাত ধরে বললো—চল্ রে পঞ্চু চল, ও যাবে না।

পঞ্চুর কিন্তু হাবুকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা ছিল না, বললো—যাবি না কিরে ? ওই ছেঁড়া জামাটা গায়ে দিয়ে আজ রাত্তিরে ঘুমুতে পারবি তো ?

তথাপি হাবু যেন বিশ্বাস করতে পারলো না, বললো—সত্যি দিচ্ছে ?

—সত্যি, সত্যি, সত্যি। কতবার বলবো? ইচ্ছে হয় চল্, না হয় থাক্ বসে!

এবার হাবুকে উঠতে হলো। উঠে পড়ে বললো—তবে চল্ যদি একখানা কম্বল পাওয়া যায়, জামাটি সত্যি যা ছিঁড়ে গেছে!

—তোর তো তবু ভাল, আমার গেঞ্জিটা দেখ্ দিকি—বলে পঞ্চু গায়ের গেঞ্জিটা একহাতে টেনে ধরে হাবুকে দেখালো। হাবু দেখলো সত্যই তার জামার সঙ্গে এই গেঞ্জিটার তুলনাই চলে না। কোনখানে দু' ইঞ্চি কাপড় আস্ত আছে বলে তো হাবুর চোখে পড়লো না। এতে পঞ্চু কি করে শীত কাটায় ভেবে হাবু অবাক হয়ে গেল।

ননী এবার নিজের কথা তুললো, বললো—তোদের তো তবু জামা গেঞ্জি একটা কিছু আছে, আমি তো কোঁচার কাপড়টাই গায়ে দিয়ে আছি।

নিজেদের অবস্থায় হাবুর দুঃখ হোল। সত্যই তো তাদের একখানা করে কম্বল দরকার, না হলে এই শীতে তারা তো মারা পড়বে।

মল্লিকবাড়ী বেশী দূর নয়। কথাবার্তা কইতে কইতে কোন্ ফাঁকে তারা ফটকের সামনে এসে পড়লো। ফটকের সামনে তখন শতাধিক ভিখারীর ভীড় জমে গেছে। অতগুলি লোক তাদের আগেই খবর পেয়ে এসে জুটেছে দেখে পঞ্চু চটে উঠে বললো—দেখেছিস, এ-ব্যাটারা আমাদের আগেই এসে জুটেছে।

ননী বললো—তা জুটুক, তা বলে তো আর এদের পিছনে আমরা পড়ে থাকবো না। এদের পিছনে পড়ে থাকলে আমাদের একখানা কম্বলও জুটবে না, তা আমি আগে থেকেই বুঝতে পারছি। তা, দেখ পঞ্চু, আমি ভীড় ঠেলে এগোই, তুই আর হাবু আমার পিছনে আয়।

ধাক্কাধাক্কি করে অনর্থক হাঙ্গামা সৃষ্টি করার ইচ্ছা হাবুর ছিল

না, বললো—মিছে ধাক্কাধাক্কি করে লাভ কি। যার পাবার হবে সে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও পাবে।

ননী এবার রাগলো। খাবার কোনও ঠিক-ঠিকানা না থাকলেও প্রতিদিন সকালে দুশো ডন-বৈঠক দিয়ে শরীরটাকে সে মজবুত করেছে। দাঙ্গাহাঙ্গামাকে সে হাবুর মত ভয় করবে নাকি। বললো—বেশ, থাক্ তবে তুই এখানে দাঁড়িয়ে—বলে পঞ্চুর হাত ধরে সে আগিয়ে যাচ্ছিল এমন সময়ে ওধারে কাঙালীদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। ননী থেমে পড়লো। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য পঞ্চুর কাঁধের উপর হাত রেখে লাফিয়ে উঁচু হয়ে একবার দেখে নিলে। ফটকের সামনে মল্লিক-বাড়ীর দরোয়ান দু'জন কম্বল বিলি করতে সুরু করে দিয়েছে। চারিপাশে কম্বল নেবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে। সেইজন্যই এত গণ্ডগোল। ননীর আর দেরী সইল না, পঞ্চুও হাবুর হাত ধরে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

কিছুক্ষণ বাদে ভীড় কমতে সুরু করলে হাবু, ননী ও পঞ্চু এক একখানি করে কম্বল নিয়ে ভীড়ের বাইরে এলো। হাবু একখানি লাল কম্বল পেয়েছিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একবার সে দেখলো। টক্‌টকে লাল রংটা তার ভারী মনে লাগলো। আলোয়ানের মত করে কম্বলখানি গায়ে জড়িয়ে পঞ্চুর পানে ফিরে বললো—দেখতো পঞ্চু, আমায় কেমন দেখাচ্ছে ?

পঞ্চু দেখলো হাবুর ফরসা চেহারায় লাল কম্বলখানি সুন্দর মানিয়েছে, বললো—বেশ।

ননীও দেখলো। নিজের কালো কম্বলখানা তার পছন্দ হয়নি, সোজাসুজি বলে বসলো—তোর কম্বলখানা আমার সঙ্গে বদলি করবি হাবু ?

—বাঃ রে, তা কেমন হবে ?

—কিন্তু আমার কম্বলের রংটা কেমন কালো দেখছিস তো ?

কখ্খনো নষ্ট হবে না, আর তোর লাল রং একটু ধুলো লাগলেই নষ্ট হয়ে যাবে।

—তা হোক, আমার কম্বলের রংটা কিন্তু তোদের সকলের চেয়ে ভাল, এমন লাল রংয়ের মত রং আছে, তুই-ই বল?

—বদ্‌লাবি কি না তাই বল্?

—না, তোর ওই কালো কম্বলের সঙ্গে বদল করবো না।

—আমার জন্যই কিন্তু কম্বলখানা পেলি?

—তাই বলে তোকে দিয়ে দিতে হবে নাকি? আমি না এলে কি দিত?

—আচ্ছা, একদিনের জন্যে বদল কর?

হাবু জোড় করে ঘাড় নেড়ে বললো—না।

—আচ্ছা—বলে ননী শাসালো। কিন্তু অত সহজে ভয় পাবার ছেলে হাবু নয়। বয়স না হয় তার কমই হোল, কিন্তু বুদ্ধি তো ননীর চেয়ে কম নয়। তবে ননী যদি জোর করে কম্বলখানা কেড়ে নেয় এই ভেবে সে ভীড়ের মধ্যে সরে পড়লো।

কিছুক্ষণ বাদে গাড়ীবারান্দার নিচে ফিরে এসে পুরু কাগজখানি পেতে হাবু শুয়ে পড়লো। কম্বলখানি গায়ে দিয়ে তার বেশ গরম বোধ হচ্ছে। ইলেক্‌ট্রিকের আলো পড়ে লাল রঙটা ঝল্‌মল্ করছে, চোখ ঠিক্‌রে যায়। যারা এমন কম্বলখানি দান করলো তাদের কত দয়া। কিন্তু ফুটপাতে শুয়ে এমন কালো কাপড় আর ছেঁড়া জামার উপর এই কম্বলখানি গায়ে দেওয়া মানায় না। কাল যেমন করেই হোক একখানা সাবান কিনে কাপড়-জামাটা কেচে ফরসা করে নেবে। এবার সে একটু ভদ্র হবার চেষ্টা করবে। কাঙালীবৃত্তি আর ফুটপাতে শোয়া সে ছেড়ে দেবে। কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটা চাকরী জুটিয়ে নিয়ে দু'পয়সা উপায় করে সে ভদ্র হবে। আজ তো সে নিজেকে ভদ্র বলেই পরিচয় দিত, বন্যায় সব ভেসে গেল বলেই না। মায়ের কথা হাবুর মনে পড়লো···ছোট ভাইটীর সঙ্গে পুকুরের জলে

চোর চোর খেলার কথা···ভাবতে ভাবতে কোন এক সময় হাবু ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাবু স্বপ্ন দেখলো। দেখলো: একজন ষণ্ডামার্কা লোক তার কম্বলখানা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এক হাত দিয়ে হাবুর হাত দুটো সে মুচড়ে ধরেছে, করবার মত কিছুই নেই।

স্বপ্ন দেখে হাবুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখে সকাল হয়ে গেছে, কম্বলখানা গায়ে ঠিকই আছে। হাবুর মুখে হাসি ফুটলো। উঠে কম্বলখানা একবার ভাল করে ঝেড়ে নিয়ে হাবু গায়ে জড়ালো। তারপর রাস্তার কল হতে মুখ হাত ধুয়ে সে চললো ননী ও পঞ্চুর সন্ধানে। সাবান কিনবার জন্য তাদের কাছ হতে সে আজ দু'পয়সা ধার নেবে। এখনি কেচে দিলে কাপড় জামাটা দুপুরের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে তারপর সে বাড়ী বাড়ী ঘুরবে চাকরীর সন্ধানে।

কতটুকুই বা পথ। কিন্তু এতটুকু আসতেই কম্বলখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনবার সে গায়ে জড়ালো। ভাল করে গায়ে জড়িয়ে প্রতিবারেই মনে হয় বুঝি ঠিক করে জড়ানো হয়নি। আবার খুলে ফেলে নতুন রকমে সে কম্বলখানি গায়ে জড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু পরণের ময়লা কাপড়-জামাটির জন্য ততবারই তার মন খুঁৎ খুঁৎ করে ওঠে।

ঠিকানায় এসে ননী কি পঞ্চু কাউকেই হাবু দেখতে পেলে না। এত সকালে আর কোথায় যাবে, নিশ্চয়ই লাহাবাড়ীতে জিলিপি খেতে গেছে ভেবে ফেরবার পথে সে লাহাবাড়ীর সামনে এলো। ফটকের সামনে ফুটপাতের উপর দু' সারি কাঙালী বসে আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ননী কি পঞ্চুকে দেখতে পেলে না। দেখলো সকলেই তার কম্বলখানির পানে তাকিয়ে দেখছে। ইচ্ছা হোল এদের দলে ভিড়ে জিলিপি খেয়ে যায়, এমন কতদিন তো খেয়ে গেছে। কিন্তু আজ এমন কম্বলখানা গায়ে দিয়ে এদের মাঝে বসতে তার ইচ্ছা হয় না। সে তো ঠিক করেই ফেলেছে আজ হতে

কাঙালীবৃত্তি ছেড়ে দেবে। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবার জন্ম সাবান কেনবার পয়সা দুটো সে কোথায় পাবে তাই ভাবছিল। হঠাৎ পাশ দিয়ে একজন ভদ্রলোককে চলে যেতে দেখে তার একটা কথা মনে পড়লো, তাড়াতাড়ি লোকটার কাছে ছুটে গিয়ে হাত পাতলো—বাবু একটা পয়সা, কাল সকাল থেকে কিছুই খাইনি।

না-খাওয়ার কথাটা মিথ্যা, কিন্তু না বলে তো উপায় নেই, সাবান কিনবো বললে তো আর কেউ পয়সা দেবে না।

বাবুটা মুখ ফিরিয়ে একবার চেয়ে দেখলো। তারপর একটি কথাও না বলে গম্ভীরভাবে চলে গেল। হাবু কিন্তু এতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হোল না, এম্‌নি ব্যবহার তো সে কতবার পেয়েছে। তাড়াতাড়ি সাম্‌নের আরেকজন বাবুর কাছে গিয়ে সে হাত পাতলো—বাবু, একটা পয়সা?

লোকটি দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল, বললো—পয়সা কি হবে রে? বিড়ি খাবি তো?

—না বাবু, কাল সকাল থেকে কিছুই খাইনি।

—খাস্‌নি তো কম্বল কেনার পয়সা পেলি কোত্থেকে? সেখানে গিয়েই খা' না?

—ওটা মল্লিকবাড়ী থেকে দিয়েছে বাবু। সেখানে তো বাবু দুটো তিনটের আগে কাঙালী বিদায় হয় না, এখন গেলে বসে থাকতে হবে।

—বেশ, তবে কম্বলখানা বিক্রী করে দে'না অনেক পয়সা পাবি।

—না বাবু, রাত্তিরে ভয়ানক শীত করে, ফুটপাতে শুয়ে থাকি।

—ফুটপাতে শুয়ে থাকিস্ কেন? কেউ নেই—বাপ-মা?

—বাবাকে তো দেখিনি, আমি যখন খুব ছোট তখন তিনি মারা গেছেন। মা আর একটা ছোট ভাই ছিল, এ বছর বন্যায় ভেসে গেছে। তারপর কলকাতায় চলে এসেছি।

—দেশে কেউ নেই বুঝি ?

—আপনার জন আর কেউ নেই বাবু।

লোকটীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাবু, অনেকটা পথ এসে পড়েছিল, বললো—দিন্ না বাবু, একটা পয়সা ?

ভদ্রলোক মনিব্যাগ খুলে একটা পয়সা হাবুর হাতে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—দেখিস্ বিড়ি খাসনি কিন্তু !

হাবু সে কথার জবাব দিলে না, পয়সাটা ট্যাকে গুঁজলো। আরেকটী পয়সা হলেই সে সাবান কিনবে। তাড়াতাড়ি আরেকজন পথিকের সামনে গিয়ে সে হাত পাতলো—বাবু একটা পয়সা।

কিন্তু দু'ঘণ্টা ধরে লোকের পিছনে পিছনে ঘুরেও আর কারুর কাছ হতে আরেকটা পয়সা হাবু আদায় করতে পারলো না। শেষে সে ঠিক করে ফেললো এক পয়সা দিয়ে যেমন হোক একখানি সাবান সে কিনবে। কাপড়খানাই হয়তো তাতে ভাল পরিষ্কার হবে না, তা না হোক উপায় কি, আর পয়সা যখন পাওয়া গেল না।

হাবু ফিরলো।

আসছিল একটা গলির মধ্য দিয়ে। আসতে আসতে দেখে একটী ছোট ছেলে একখানি সাবান ও আরো কয়েকটী সওদা নিয়ে এদিকে আসছে। ছেলেটী কাছে এলে হাবু বললো—সাবানটা আমায় দেবে খোকা, একটা পয়সা দোব ?

—বাঃ রে, এর দাম যে চার পয়সা।

—আরো তিনটে পয়সা এখনি তোমায় এনে দিচ্ছ ?

—না। এখানা দিলে মা বকবে, তুমি মুদীর দোকান থেকে আর একখানা কিনে নাওগে না ?

হাবু দেখলো এ সুযোগ হারালে চলবে না। একবার দেখে নিলে গলির মধ্যে কেউ নেই, সরে পড়তে বেশীক্ষণ লাগবে না। চট্ করে ছেলেটীর হাত হতে সাবানখানি ছোঁ মেরে সে ছুটলো।

খোকার গলা পেয়ে খোকার বাবা পাশের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, ব্যাপার দেখে সে হাবুর পিছনে তাড়া করলো—চোর চোর।

গলির মোড় পার হয়ে কিছুদূর যেতে-না-যেতেই হাবু ধরা পড়ে গেল। চারিপাশে লোক জমে হাবুকে প্রহার করতে সুরু করে দিলে। মার খেতে খেতে হাবু বসে পড়লো। হাতের সাবানখানা কোথায় ছিট্‌কে গেল। জামাটা ছিঁড়ে ঝুলে পড়লো। নতুন কম্বলখানা কখন যে কে কোন্ দিক দিয়ে টেনে নিলে হাবু জানতেও পারলো না। মার খেয়ে তখন তার ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে।

একজন পাহারাওলা গোলমাল দেখে এদিকে এলো। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলো একটি চোর ধরা পড়েছে। ভীড় সরিয়ে সে ভিতরে ঢুকলো, হাবুর কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে বললো—চল্ বেটা থানামে।

সামনের ভীড় সরে গেল। সহসা একটা দম্‌কা হাওয়ায় হাবুর শীত করে উঠলো। তাড়াতাড়ি কম্বলখানি গায়ে জড়াতে গিয়ে দেখে কম্বলখানি নেই। কম্বল নেই দেখে সে থমকে দাঁড়ালো। পিছনে তাকিয়ে পথের উপরেও কম্বলখানি পড়ে নেই দেখে বিহ্বল-ভাবে পাহারাওলাটার মুখের পানে চেয়ে সে বললো—আমার কম্বল?

হাবু থেমে পড়েছে দেখে পাহারাওলাটা তার হাতে জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে টেনে দিয়ে চললো। হাবুর কোন কথাই সে শুনলো না।

হাবু কেঁদে ফেললো। তার চোখের জলে, ঠোঁটের রক্তে এক হয়ে গেল।

পাঁচ

হাবু ভয়ে ভয়ে বইয়ের দোকানগুলোর সামনে ঘোরাফেরা করে, অমন সাজানো-গোজানো দোকানের মধ্যে ঢুকতে তার সাহসে কুলায় না। পয়সা দিয়ে বই কিনবে তবুও না।

হাবু কাল সারা রাত ধরে ভেবেছে। থানা থেকে বেরিয়ে চারদিন খুচরো বিড়ি পাকিয়ে একটা টাকা সে জমিয়েছে। দেখে শুনে সে একখানি বই কিনবে। রোজ সকালে পড়ে পড়ে বইখানা শেষ করে ফেলবে। তারপর মল্লিক-বাড়ী খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ করে গিয়ে বসবে কোন একটা বিড়ির দোকানে। সন্ধ্যা পর্যন্ত যত বিড়ি হয় হবে, পয়সাটা নিয়ে বিকেল বেলা বেরিয়ে বেড়াবে পথে পথে—সেই গড়ের মাঠ পর্যন্ত....।

সেই সকাল থেকে এসে হাবু দোকানের সামনে বসে আছে, দোকান তো খুললো এত দেরীতে, কিন্তু এখন আর ঢুকতে সাহস হয় না।

হাবু ঘুরছে ফিরছে এমন সময় জামাটায় টান পড়লো—কি রে এখানে কি ?

হাবু ফিরে দেখলো নিধু, বললো—বই কিনবো।

—ওঃ, গ্যাসের আলোয় পড়ে বিদ্যাসাগর হবি, তা গ্যাসে তো এখন আর আলো নেই রে সব ঠুলি লাগানো।

হাবু একজন সঙ্গী পাওয়ায় উৎসাহিত হোল, বললো—আয় না আমার সঙ্গে, একখানা বই কিনি। একলা ভিতরে যেতে সাহস হচ্ছে না।

—আর বই কেনে না, চল্।—নিধু হাবুর একখানি হাত ধরে আকর্ষণ করে। হাবু কি যেন প্রতিবাদ করতে চায়, কিন্তু সে কিছু

বলার আগেই নিধু বললো—তুই কি পাগল হলি নাকি? এইভাবে তুই কদ্দিন পড়াশুনা করতে পারবি বলত? বড় জোর তুই একটা পাস করবি, তাতে হবে কি শুনি? পাঁচটা পাস দিয়ে উকিল হয়, তারপর গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে দু' আনা চার আনা পয়সার জন্যে, জুতো জামা ছিঁড়ে গেছে, নতুন কিনতে পারে না,—ছেঁড়া ছেঁড়াই সই। তিন-চারটে পাস করে কত লোক ত্রিশ টাকার চাকুরীর জন্য ফ্যা-ফ্যা করছে, তা জানিস্।

হাবুর হাত ধরে টানতে টানতে নিধুই খানিকটা পথ এগিয়ে এলো, তারপর জিজ্ঞাসা করলো—কত পয়সা আছে তোর কাছে বলত?

—একটা টাকা।

—তাই দিয়ে বই কিনে নষ্ট করবি কেন? টাকাটা খেলিয়ে বাড়িয়ে নে। ব্যবসা কর, টাকা জমা। টাকা থাকলেই মানুষ বলে লোকে মানবে, না থাকলে তুই যতই লেখাপড়া শেখ্, কেউ ফিরেও তাকাবে না।

—কিন্তু ব্যবসা আমি করবো না। বিড়ি পাকিয়ে খাব, সেই ভালো।

—আরে, এ তেমন ব্যবসা নয়, ঠিক জমাতে পারলে লাল হয়ে যাবি···চল আমার সঙ্গে—নিধু হাবুর হাত ধরে অগ্রসর হলো।

বেশী দূর নয়। একটি মাঠের সামনে প্রকাণ্ড বাড়ী, নিচে হোটেল, উপরে বোর্ডিং। হাবুকে নিয়ে তর-তর করে উপরে উঠে যায়। বরাবর চারতলার ছাদের উপর একখানি ঘর। ইস্প্রিঙের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখা গেল চারটে টেবিলকে ঘিরে একঘর লোক জড়ো হয়েছে। টেবিলের উপর জমা হয়েছে খুচরো টাকা-পয়সার স্তূপ, আর চারজন চারপাশে বসে খেলছে তাসের বাজী।

নিধু বললে—টাকা বের কর্।

হাবু বললো—এ যে জুয়া!

—এই জুয়াই তো রাতারাতি লোককে রাজা করে দেয়। দেখ্ না কি করি। কত তোর কাছে আছে বের কর্ দিকি?

—না ভাই, জুয়া আমি খেলবো না।

—খেলবো না মানে, তুই খেলে দেখ্ কি হয়, তার পর বল্‌বি।

ঠিক এই সময়ে একটি টেবিলের সাম্‌নে চেঁচামেচি পড়ে গেল। একটি লোক চীৎকার করে উঠলো—তোমাদের সব জোচ্চুরী, হাতের কারসাজি, না হলে এই তাস তোমার হাতে আসতে পারে না। আমার সব টাকা ফেরৎ চাই···

—কাহে ?

—কাহে নেহি ? সাড়ে সাতশো টাকা ঠকিয়ে নিয়েছ আবার কথা। সব আমার ফেরৎ চাই। না হলে আমি পুলিশ ডাকবো···

—বাচ্চু খাঁ। ইয়ে বাবুকো হিঁয়াসে নিকাল দেও।

—ঠিক হ্যায় হুজুর—এক বলিষ্ঠ পাঠান লোকটিকে বাইরে নিয়ে গেল।

নিধু বললো—আয়।

হাবু বললো—দেখছিস্ সাড়ে সাতশো টাকা হেরে গেছে আর আমার এক টাকায় কি হবে ?

—কি হবে, কি হবে না সে আমি জানি, তুই বের কর্।

—না, আমি দেবো না—বলে হাবু সিঁড়ি দিয়ে ছুটলো। নিধুও অতো সহজে ছাড়বার পাত্র নয়, সেও পিছনে ছুটলো, হাঁকলো—পাক্‌ড়ো—।

বাড়ী থেকে বেরুবার আগেই দু'তিনজন হাবুকে ধরে ফেললো। নিধু ছুটে এলো, বললো—চল খেলিগে, ভয় কি ?

—না আমি খেলবো না।

—তবে আমার টাকা দে।

—তোর টাকা ?

—নিশ্চয়ই।

ক'জনের সাহায্য নিয়ে নিধু হাবুর কোঁচার খুঁট থেকে টাকাটা

ছিনিয়ে নিলে। হাবু বললো—ভালো হবে না নিধু, আমি কিন্তু এক সময়—

—সব করবি, যা—বলে নিধু উপরে চলে গেল। হাবু কিছুক্ষণ সিঁড়ির পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দরোয়ান তাকে হাঁকিয়ে দিলে।

ছয়

বোমা পড়ার যুগ।

কলিকাতা শহরে যাদের টাকা আছে তারা শহর ছেড়ে চলে গেছে, যারা তখনও যেতে পারেনি তাদের মন ভারী হয়ে আছে।

কলিকাতার রাস্তা ফাঁকা, দোকানপাট অনেক বন্ধ হয়ে গেছে। কর্পোরেশনের ভ্যান ছুটছে পথ দিয়ে, মাঝে মাঝে থামে, রেকর্ড শোনায়, গান শেষ হলেই চীৎকার তোলে: আপনার বাড়ীতেও বোমা পড়তে পারে, সেজন্য সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কতকগুলি কথা সব সময়েই আপনাকে মনে রাখতে হবে · ইত্যাদি ··

হাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে, একবার ভাবে কোথায় চলে গেলে হয় না, আর যাবেই বা কেন—মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই যখন গেল তখন তারই বা অতো মরার ভয় কিসের?

ভাবে আর এলোমেলো ভাবে পথে ঘুরে বেড়ায়।

সেদিন পথের মোড়ে একখানি প্রোপাগ্যাণ্ডা ভ্যানে গান শোনাচ্ছিল:

দুঃখে যাদের জীবন গড়া
তাদের আবার দুঃখ কিরে।
হাসবি তোরা বাঁচবি তোরা
মরণ যদি আসেই ঘিরে···

হাবু একমনে শুনছিল। গানের কথাগুলো বেশ। কিন্তু হঠাৎ রেকর্ডখানি শেষ করে সুরু হলো বক্তৃতা: আপনার বাড়ীতেও বোমা পড়তে পারে···

গানের প্রথম কবিতাটি গুন্-গুন্ করতে করতে হাবু এলো ভীড়ের বাইরে। এসে সবে ফুটপাত থেকে নেমেছে, সেখানে ছিল

একটা কলার খোসা ; তাতে পা পিছলে সরাৎ—একেবারে এক ঘোড়ার গাড়ীর নিচে।

ঘোড়াটা রুখে দাঁড়ালো, একটুর জন্য হাবু যে ভাবে রক্ষা পেলো, সেটা নেহাৎ অদৃষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়।

হাবুর চোট লেগেছিল সামান্য, কোচম্যান নেমে এসে তাকে তুললো, মুখের পানে তাকিয়েই তো অবাক্—হাবু!

—জীবন!

আর কিছুই বলতে হোল না, যেখানে যা কেটেকুটে গিয়েছিল একটা টিউবওয়েল থেকে তাতে জল দিয়ে জীবন বললো—এখন তোর কোন কাজ আছে?

—না।

—নে, তবে উঠে চল।

জীবন হাবুকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে রওনা হোল।

গাড়ী এসে দাঁড়ালো শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশে। জীবন একটা ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে হাবুর ক্ষতগুলোতে আইডিন লাগিয়ে দিলে, তারপর বললো—খাবি কিছু, পাঁপরভাজা, মুড়ি, আলুর চপ?

কোন সম্মতির অপেক্ষা না করে জীবন সামনের দোকানে ছুটলো।

অনেকদিন এমন মুখরোচক কিছু হাবুর হাতে পড়ে নি, চিবুতে চিবুতে তার মনটা সরস হয়ে উঠলো, হাত-পায়ের ব্যথা সে ভুলে গেল।

কোন এক সময় একটি লোক এসে হাঁকলো—এই গাড়োয়ান, ভাড়া যাবি?

জীবন বললো—কোথায়?

—হাওড়া।

—না। এখন খাচ্ছি।

সেখানে আর গাড়ী ছিল না, লোকটি বললো—খাওয়া হলে যাবি তো? আমি না হয় একটু দাঁড়াচ্ছি।

—পাঁচ টাকা দেবেন?

—পাঁচ টাকা, বলিস্ কি রে, এইটুকু পথ!

—এখন এই রকমই হয়েছে, হাওড়া পাঁচ টাকা, শিয়ালদা আড়াই টাকা।

—কিছু কম কর্ না?

—না বাবু, চার টাকা পনেরো আনা বললেও যাবো না।

ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো—আচ্ছা, চল্। পাঁচ টাকাই দোব। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে।

জীবন বললো—সাতটার গাড়ী ধরবেন তো বাবু? চলুন, সে আমি ঠিক ধরিয়ে দেবো'খন।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ হোল। হাবু বললো—তা'হলে আমি এবার নেমে যাই?

—এখনি গেলে হবে না, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। চল্, আমি তোকে একটা চাকরী দোব।

ভদ্রলোককে সপরিবারে হাওড়ায় পৌঁছে দিয়ে জীবন ফিরলো, বললো—তোকে একটা কাজ দোব বলেছিলাম না? আমারই একজন বিশ্বাসী লোক চাই; তুই আমার কাছে থাক। ঘোড়া দুটোকে একটু ঘাস-জল খাওয়াবি আর সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে থাকবি।

—এই ঘোড়ার গাড়ী তোর নাকি?

—হ্যাঁ, মালিক বোমার ভয়ে দেশে পালিয়েছে, আমি সব কিনে নিয়েছি পঞ্চাশ টাকায়—দুটো ঘোড়া আর এই গাড়ী।

—পকেট মারা ছেড়ে দিলি তা'হলে?

—তার চেয়ে বড় দাঁও পিটছি এখন, সেইজন্যই তো তোকে দরকার।

হাবুর দু'চোখ ধারালো হয়ে উঠলো।

—কাজ খুব কঠিন নয়। রাত্রিতে যে সব সওয়ারী যায় তাদের সামনে তুই গা ঢাকা দিয়ে থাকবি। গাড়ী চলতে সুরু করলে তুই ওই পিছনের সহিসের আসনটায় উঠে বসবি। যখন স্টেশনের মুখে গাড়ী ঢুকবে তখন সেই ভীড়ের মধ্যে করবি কি—গাড়ীর চালের উপর ছোট-খাটো যে সুটকেশ কি বাক্সটি হাতের কাছে থাকবে টুপ করে নামিয়ে নিয়ে সরে পড়বি। তারপর সটান চলে আসবি পুলের এপারে, আমার একখানি ঘর ঠিক করা আছে সেখানে···

হাবু বললো—তাপর তারা যখন খুঁজবে ?

—সে আমি বুঝবো, তোকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না।

—আমাকে যখন ধরে মারধোর করবে ?

—সে আমি বুঝবো'খন।

—আমাকে যদি পুলিশে ধরে ?

—বলবি তোর নিজের বাক্স। তবে এখন আর পুলিশ-টুলিশ নেই রে। যে অন্ধকার রাস্তা, দেখছিস্ তো, আলো যা জ্বলে সে না জ্বলার মত। এখন আর কেউ কারুর দিকে অতো নজর করে না।

হাবু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো।

জীবন তার মুখের পানে তাকিয়ে বললো—কী ? রাজী ? তাহলে এই ট্রিপ্ থেকেই সুরু কর্—ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি শেয়ার কেমন ?

হাবু তার বড় বড় চোখ দুটি জীবনের মুখের উপর তুলে ধরে বললো—কিন্তু একটা কথা, ধর যাদের বাক্সটি টেনে আনলাম ওইটেই তাদের সম্বল, ওইটুকুই সম্বল করে তারা বিদেশ যাচ্ছিল। আমরা ওটা নিয়ে নিলে তাদের অবস্থাটা কি হবে ?

—সে কথা ভাবতে গেলে আমাদের চলবে না। তুই যে একেবারে যীশুখ্রীস্ট হয়ে গেলি দেখছি। আমরা টাকা রোজগার

করবো, যত পারবো" তত বড়লোক হবো। বেশী টাকা হলে লেকের ধারে বাড়ী করবো, মোটর গাড়ী করবো, মাথার উপর ফ্যান ঘুরবে, রেডিও চলবে···

—কিন্তু··

—কিন্তু আবার কিসের? যার গেল, তার গেল। টাকা একজনের পকেট থেকে না গেলে আরেক জনের পকেটে আসবে কেমন করে শুনি?

—তা তো জানি, কিন্তু তার ছেলেমেয়েরা কি খাবে বল দিকি?

—আমাদের-ই বা টাকা না হলে চলবে কেমন করে?

—আমাদের ঠিক চলবে। তুই তো রোজ পঁচিশ-তিরিশ টাকা গাড়ী চালিয়ে পাচ্ছিস্। এই এক একদিনের রোজগারে তোর তো এক একমাস চলবে, আর আমার জন্য আমি ভাবি না।

—মল্লিকবাড়ীর জগন্নাথের ভোগ যদ্দিন আছে, কি বলিস্?—জীবন শ্লেষ দিয়ে কথাগুলো বললো।

সে শ্লেষ কিন্তু হাবু গায়ে মাখলো না, বললো—তা-ই তো। আমি একা লোক আমার অভাব কি? কষ্ট এখন আমার গা-সহা হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের কি হবে? ছোট ছেলেমেয়েগুলো যখন খেতে না পেয়ে কাঁদবে বিদেশে···ধর্ তোর ছোট ভাই শরতের মত একটা ছেলে আছে তাদের···

জীবন উষ্ণ হয়ে উঠলো, বন্যায় সে আজ সর্বহারা, যা গেছে তার কথা সে আর ভাবতে চায় না, রুক্ষকণ্ঠে হাবুকে বাধা দিয়ে বললো—থাক্ থাক্, আর ধর্মতত্ত্ব শোনাবার দরকার নেই, তুই পারবি কি না তাই বল?

হাবু বললো—না।

—বেশ, তা'হলে আর তোকে আমার দরকার নেই, তুই যা—

হাবু গাড়ী থেকে থেকে নেমে এলো, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল পথের অন্ধকারে।

কী ভেবে ক' লহমা পরে জীবন একবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকলে, —হাবু, ওহাবু।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

জীবন আপন মনেই বলে উঠলো—যাক্ গে, মরুক গে—

সাত

হাবুর মনটা অত্যন্ত খারাপ। টাকা নেই, রোজগার করার উপায় নেই। কয়েকটা বিড়ির দোকানে ঘুরেছে, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। সব লোক সহর ছেড়ে পালাচ্ছে, সর্বত্র কেমন যেন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব। বিড়ি কিনে খাবার লোক নেই, বিড়ি পাকিয়ে কি হবে? বেচারা হাবুর তাই ঘোরাফেরাই সার হয়। শুধু ভাবে আর পথ চলে।

পথে পথেই হাবুর সন্ধ্যা হয়ে আসে। আলোগুলো জ্বলে ওঠে। কিন্তু পথ মোটেই আলোকিত হয় না। যদি ঠুলিই লাগানো থাকে তাহলে কেন যে আলোগুলো জ্বালানো হয় সেই কথাই সে ভাবে। শেষে আর ঘুরতে ভালো লাগে না, একটা বড় বাড়ীর রোয়াকের উপর সে এলিয়ে পড়ে।

সকালে আবার সেই যেতে হয় মল্লিক-বাড়ীতে খাবার জন্য। সেখানেও ভীড় নেই, ভিখারীগুলোও যেন সব দল বেঁধে পালিয়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করছে এমন সময় কোথা থেকে নিধু এসে হাবুকে চমকে দিলে। হাত ধরেই হিড়হিড় করে এক টান, বললো—আমার উপর খুব রাগ করেছিস্, না?

হাবু কোন কথা বললো না।

—তোর টাকাটা আমি ঠিক দিয়ে দেব দেখিস্।

হাবু আর চুপ করে থাকতে পারে না, বললো—পাবি কোথায় যে দিবি?

—দেখ না, কোথায় পাই। রিক্সা টানছি। হাওড়া—শিয়ালদা এক-এক খেপ্ এক-এক টাকা, কাল এগারো টাকা রোজগার করেছি।

—তা'হলে আমার টাকাটা নিলি কেন?

—ওঃ ভাই আমার কাছে পয়সা থাকে না, কোথা দিয়ে যে খরচ হয়ে যায়। তোর মত কিপ্পন হলে অনেক জমিয়ে রাখতাম।

—থাক থাক, আর চালাকির দরকার নেই, যা করছিস্ করগে যা—

—রাগ করছিস্, কর। তাতে তোর টাকা তো আর আমি দিচ্ছি না। যদি তোর টাকার দরকার থাকে, তা'হলে আমার সঙ্গে চল, একখানা রিকসা ঠিক করে দিই, টানবি, রোজ পাঁচ-সাত টাকা হেসে-খেলে হবে।

হাবুর মুখে চিন্তার রেখা ওঠে, বললো—রোজ পাঁচ সাত টাকা?

—রোজ রোজ। আমি দশ-বারো টাকা উপায় করি আর তুই পাঁচ-ছ টাকা রোজ পাবি না?

—আমি টানতে পারবো? যখন তিনজন উঠবে?

—দূর। তিনজন কেন, সাতজন উঠুক না? তুই তো আর কাঁধে বইছিস্ না, চাকাগুলো আছে কি জন্যে? একবার চলতে সুরু করলে গাড়ী আপনি চলবে গর্-গর্ করে। তবে হ্যাঁ, কষ্ট একটু হবে, সে কোথায় জানিস? বড়বাজারের পাথর-বাঁধানো রাস্তাটায় একটু কষ্ট হয়। হাওড়া যখন যাবি ওই পথটাকে পাশ কাটাবি। একটু বুদ্ধি খরচ করবি সব ঠিক হবে, পয়সা ছড়ানো আছে রে কলকাতায়, খালি কুড়িয়ে নেবার ওয়াস্তা ··

নিধু হাবুকে রিক্সার মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

তখন পালানোর হিড়িক, রিক্সা টানবার লোকের অভাব। অনেকগুলো গাড়ী জমে আছে, মালিক উৎসাহ দিয়ে বললো—এখনি একঠো রিক্সা লে যা।

হাবু বললো—-না, একেবারে কাল সকাল থেকে।

মালিক বললো—আরে না না, আভি সুরু কর্। তোরা

ছেলেমানুষ, যখন খেয়াল হয়েছে তখন আর্তি স্নুরু কর্। এই তো বলছিস্ খাবার পইসা নেহি, এক শোয়ারী পৌঁছে দিলে এখনি পইসা হোবে। লে যা—কুছ্ হরজা নেহি, না হয় আমাকে দো আনা পইসা কমই দিবি···

একখানা রিক্‌সা নিয়েই হাবুকে বেরুতে হয়। নিধুর নির্দেশমত হাবু রিক্‌সা নিয়ে এসে দাঁড়ালো মেছুয়াবাজারের মোড়ে। পা-দানের উপর বসে হাতলের উপর ঠুন্ ঠুন্ করে ঘণ্টা ঠুকতে স্নুরু করলো। মনটা তখন তার বেশ খুসী। এবার একটা ভালোমত রোজগারের ব্যবস্থা হোল, রোজ দুটো টাকা হলেই বা মন্দ কি! নিধু তার টাকা নিয়েছে সত্যি, কিন্তু এই উপকারটা সে-ই করলো তো।

হাবুর ইচ্ছা হোল একখানি গান ধরে, সেই পুরানো গান—একটি পয়সা দাওগো বাবু, একটি পয়সা দাও—

—এই রিক্‌সা, ভাড়া যাবি?

হাবু লাফিয়ে উঠলো—যাব। কোথায়?

—চীৎপুর রোড, নতুন বাজার যাব, কত নিবি?

—আট আনা।

—আচ্ছা চল্।

ভাড়াটে দু'জনকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে হাবু ছুটলো—ঠুং ঠুং ঠুং।

কোম্পানীবাগানের পাশে তা'রা দু'জনে গাড়ী থেকে নামলো, অন্ধকারের মধ্যে একটা সিকি হাবুর হাতে দিয়ে একজন বললো—এই নে, যা।

—চার আনা! আর?

—যা যা ভাগ, অনেক পেয়েছিস্।

—ভাড়া যে আট আনা।

—ইস্! এখান থেকে এইটুকু এসেছিস্, এজন্তে তোকে দু' টাকা দিতে হবে? আমরা দু' আনায় আসি।

—তা'হলে তখন বললেন কেন যে আট আনা দোব ?

—দেখ্ সোজা পথে মুখ বুজে চলে যা, ভাল কথা বলছি।

—আমার ভাড়া দাও!

ঠাস্ করে এক চড় এসে পড়লো হাবুর গালে। হাবু হতচকিত হয়ে গেল। প্রথমটা কি করবে ভেবে পেলে না, তারপর ফস্ করে প্রহারকারীর পাঞ্জাবীর কোণটা চেপে ধরলো।

ঠাস করে আরেক চড়।

—কী! ভাড়া দেবে না আবার মার?—হাবু প্রহারকারীর পাঞ্জাবীটা ধরে এমন টান দিলে যে চর-চর করে কাঁধ থেকে গিলে-করা পাঞ্জাবী ছিঁড়ে নেমে এল। প্রহারকারী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, প্রচণ্ড বিক্রমে সে এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো হাবুর উপর। ঘা কতক খেয়ে হাবু আর দাঁড়াতে পারলো না। বায়স্কোপের সামনে জীবনের মার খাবার দৃশ্যটি তার চোখের সামান ভেসে উঠলো। আর দ্বিধা না করে সে প্রহারকারীর পকেটের মধ্যে হতে ঢুকিয়ে দিলে, ব্যাগটা মুঠোর মাঝে চেপে ধরে ছুট দিলে যেদিকে দু' চোখ যায়···

লোক দু'জন তাড়া করে এসেছিল, কিন্তু অন্ধকারে হাবুর সঙ্গে পেরে উঠলো না তারা।

হেদোয় এসে অন্ধকারে একখানি বেঞ্চের উপর হাবু ব্যাগ খুললো : ছবি আঁকা হাতে-সেলাই-ব্যাগ, ভিতরে আঠারোখানা এক টাকার নোট, একটা আধুলি, তিনটে ডবল পয়সা। টাকাগুলো কোঁচার খুঁটে বেঁধে নিয়ে হাবু খুসি মনে বলে উঠলো—'শ্রীযুক্ত জনার্দন ভট্টাচার্যকে অকারণে প্রহার করবার জন্য শ্রীযুক্ত কাপ্তেনবাবুর আঠারো টাকা সাড়ে নয় আনা জরিমানা হোল, জরিমানার টাকা জনার্দন পাবে···'

জীবনও এই ধরণে সেদিন কথাগুলো বলেছিল, হাবু ভোলেনি।

ব্যাগটা হেদোর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে আবার পথ চলতে সুরু করলো। মনে মনে ভেবে নিলে পথের মোড়ে যে ভালো

খাবারের দোকানটি আছে ওখান থেকে এক টাকার রসগোল্লা কিনে খাবে। যদি দোকানের ভিতরে বসে খেতে না দেয়, কিনে এনে অন্ধকারে একটা গাড়ী-বারান্দার নিচে বসে খাবে। তারপর সে যাবে বরাবর সেই গাড়ীর স্ট্যাণ্ডে জীবনের কাছে। জীবনের কথাই ঠিক—কলিকাতার মতো জায়গায় ভালোভাবে বাঁচতে হলে হাত সাফাই ছাড়া পথ নেই। সজ্জনের জন্য এ নগরী নয়, সে পিক্-পকেটই হবে। ভালো ভালো কাপড়-জামা পরবে, ভালো খেতে পাবে, পড়াশুনা করারও সময় পাবে অনেক, বায়োস্কোপও দেখতে পাবে—ভদ্রলোক হবে। না হলে এই ছোটলোকের জীবন আর প্রহার। এভাবে বাঁচতে সে পারবে না। সে ভদ্রলোকই হবে ; তা সে পকেট মেরেই হোক আর চুরি করেই হোক। আজই সে যাবে জীবনের কাছে।

হাবু জোর জোর পা চালালো।

আট

হাবুর বরাত মন্দ বলতে হবে।

জীবনের কথামত হাবু সবই ঠিকঠাক করেছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলো না।

বিকাল পাঁচটা নাগাদ বড়বাজারের একটি পথের পাশে এসে বসেছিল একছড়া কলা-নিয়ে। একটি বাড়ীর রোয়াকের উপর বসে একটি একটি করে কলা খাচ্ছিল আর তার খোসগুলি পথের উপর ফেলছিল এলোমেলোভাবে। তখন অফিসের ছুটি হয়েছে, কেরাণীর দল ক্লান্তভাবে এগিয়ে চলেছে পথের উপর দিয়ে। ম্লান দৃষ্টিতে কলার খোসাগুলি ধরা পড়তেই একে একে পাশ কাটাচ্ছে। কে একজন একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল, পা পিছ্‌লে পড়ে গেল। সামনে একটি লোককে পড়ে যেতে দেখে হাবু চমকে উঠলো, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো ধরবার জন্য। লোকটির বেশী কিছু হয়নি। হাবু তার কাপড়-জামার ধূলো ঝেড়ে দিল, তারপর লোকটি অগ্রসর হলে হাবুও একটি গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো। ভদ্রলোককে তুলে ধরবার সময় তার পকেটের মানিব্যাগটি যে হাবুর পকেটে চলে এলো, ভদ্রলোক তখন তা জানতে পারলো না, যখন পারলো তখন সে অঞ্চলে হাবুর চিহ্নমাত্র নেই।

ওই কলার খোসার কায়দায় হাবু সেদিন তিনজনের পকেট মারলো, হিসাব করে দেখলো তিয়াত্তর টাকা হয়েছে।

জীবন বললো—ও টাকা তোর নামে তুই জমা দিবি পোস্ট অফিসে। একটা পাস-বই আমি করে দেব'খন।

হাবু বললো—তুই কিছু নিবি না?

—তোর টাকা আমি নিতে যাব কেন? তোর থাকা-খাওয়ার খরচ তুই করবি তা হলেই হবে।

হাবু বললো—বেশ, তাহলে কালই টাকাটা জমা করে দোব।

—কালই এক সঙ্গে এতগুলো টাকা জমা দিলে সন্দেহ করবে। দু' টাকা তিন টাকা করে রোজ জমা দিবি, যদি জিজ্ঞেস করে তো বলবি, রিক্সা টানি, যা পাই তাই জমাই।

হাবু ভারী খুসি, ভাঙ্গা তক্তাপোষটায় শুয়ে পড়ে সে গান ধরলো—

আমি বনফুল গো
ছন্দে ছন্দে ভ্রমি আনন্দে
আমি বনফুল গো…

জীবন হাসতে হাসতে বললো—এখন তো খুব ফূর্তি, আর তখন বলেছিলি আমি ও-কাজ করবো না। আরে বাপু, বিড়ি পাকিয়ে ক'দিনে এতো টাকা হোত বল ত? তুই আজ একদিনে যা উপায় করলি, পাঁচটা পাস করে এক মাস অফিসে কলম পিষলেও তা হোত-না।

—কিন্তু মার…পুলিস…

—অত বিচার করতে গেলে জীবনে পয়সা রোজগার করা চলে না। জানিস তো no risk no gain. আমরা সোজাসুজি পকেট মারছি আর বড়লোকেরা ব্যবসা করার নামে আমাদের পকেট কাটে, তা তো জানিস্ না।

—তাদের তো পুলিশ ধরে না?

—টাকা থাকলে আমাদেরকেও ধরবে না। দেখিস্ না বড়লোকে কত চুরি-জোচ্চুরি করে তাদের কিছুই হয় না। আগে একখানি মোটরগাড়ী কিনতে হবে বুঝলি…

—পকেট কেটে মোটারগাড়ী হবে?

—হয় কি না হয় দেখ না…

এই মোটরগাড়ী কেনার স্বপ্নই পরদিন হাবুর বিপদ ঘটালো। যতটা সাবধান হওয়া দরকার তা সে হয়নি। ব্যাংকে টাকাটা জমা

দিয়ে ফিরছিল। পাশের লোকের পকেটটা ভারী বলে মনে হওয়ায় তার পকেটের মধ্যে হাতটা ভরে দিল। ট্রামে ভীড় ছিল খুবই, তবু লোকটি কেমন করে যেন টের পেলে। একেবারে নোটের তাড়া শুদ্ধ হাবুর হাত চেপে ধরলো।

তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত : ভদ্রলোক কংগ্রেসকর্মী, কাজেই পকেটমারকে মারধর করার পক্ষপাতী তিনি মোটেই নন, হাবুকে তিনি পুলিশের হাতে দিলেন।

জীবন খবর পেয়েই ছুটে এলো। হাবু তখন 'লক্-আপে'র এক কোণে দু' হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে বসে। জীবনকে দেখেই সে হু হু করে কেঁদে ফেললো। জীবন বললো—তুই কিছু ভাবিসনি, আমি সব ঠিক করে দোব, তুই খালি কোর্টে দাঁড়িয়ে বলবি, 'পকেট মারিনি, লোক ভুল করেছে...'

জীবনের কথায় হাবু বিশেষ কোন সান্ত্বনা খুঁজে পেলে না। পকেট মারতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে, যে কথাই সে বলুক না কেন, জেলে যে যেতে হবে সে সম্বন্ধে হাবুর মনে এতটুকু সন্দেহ রইল না। এই একটা ঘরের মধ্যে একবেলা বন্ধ থাকতেই এত কষ্ট, জেলখানায় ছ'মাস কি একবছর থাকতে হলে আরো কত কষ্টই না হবে। হাবু যত ভাবে ততই আকুল হয়ে ওঠে। খিদে-তেষ্টা থাকে না, রাত্রিতে শুধু এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়লো।

তিন দিন হাজতে থাকার পর হাবুকে কোর্টে হাজির করা হোল। জীবন ইতিমধ্যে একজন উকিল লাগিয়েছিল। সেই কালো কোটপরা লোকটি হাবুর পিঠ চাপড়ে সাহস দিয়ে বললো—কোন ভয় নেই, সত্যি কথা বলবি তাহলেই খালাস।···

উকিলবাবুর এই 'সত্যি কথা'টার মর্ম হাবুর অজানা ছিল না, কাল বিকালে জীবন বার বার তাকে শিখিয়ে গেছে, যেন সে বলে 'আমি পকেট মারিনি,' কোন মতেই যেন সে সত্য কথা স্বীকার না করে। তা'হলেই কেল্লা ফতে।

হাবু কিন্তু কোন মতেই মনকে বোঝাতে পারছে না,—সত্যি না মিথ্যা বলবে? ছেলেবেলা থেকেই সে শুনে আসছে, একটা মিথ্যাকে আশ্রয় করলে অনেক মিথ্যা বলতে হয়। পকেট মেরে সে তো একবার মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, সেই মিথ্যাকে সমর্থন করার জন্য আবার অনেকগুলো মিথ্যা বলতে হবে···

সহসা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে সরাসরি প্রশ্ন করলো—তোমার নাম হাবু?

হাবু হক্‌চকিয়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি বললো—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা আমার ডাক-নাম।

—ভাল নামটা কি বলত?

—শ্রীজনার্দন ভট্টাচার্য।

—তুমি পকেট মেরেছিলে?

হাবুর একবার মনে হল জীবনের শিখিয়ে দেওয়া কথাটাই সে বলবে কিন্তু তখনই আবার মনে পড়লো তার বাবার কথা। তিনি বলতেন, 'সত্যই ভগবান, যে যত বেশী সত্যকে মেনে চলতে পারবে জীবনে সে কষ্ট পাবে তত কম। দেখছিস না গান্ধীজী সত্যকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন তাই তিনি আজ পৃথিবীর সব মানুষের উপরে।' হাবু ফস্ করে বলে বসলো—আজ্ঞে হ্যাঁ। কাঁথীতে আমার বাড়ী, ঝড়জলে সব ভেসে গেল—বাবা, মা, ভাই,

বোন···কলকাতায় এসেছিলুম, কিন্তু এখানে কাজ-কর্মের বিশেষ কোন সুবিধা হোল না, শেষে···

শেষটুকু শোনার প্রয়োজন হোল না। ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিলেন—পাঁচ ঘা বেত, আর সৎভাবে থাকার জন্য মুচলেখা।

ঘণ্টাখানেক বাদে বেত খেয়ে যখন হাবু পথে নামলো তখন তার পিঠ আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

জীবন এসে ধরলো, বললো—তুই অত ভীতু, অত করে শিখিয়ে পড়িয়ে দিলুম, তবু···

জীবন থেমে গেল, সেই কংগ্রেসী ভদ্রলোক এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন, হাবুকে তিনি বললেন—কাজ করবি ?

হাবু মুখ তুলে দাঁড়ালো।

—ভারী কাজ কিছু নয়, থাকবি খাবি, আর সামান্য আপিসের কাজকর্ম···

হাবু হাঁ-না কিছু বলার আগেই জীবন বললো—আপনার ঠিকানাটা লিখে দিন, আপনার সঙ্গে কাল গিয়ে দেখা করবে···

ভদ্রলোক একটুকরো কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিলেন :

শ্রীঅতুল সেন

মাণিকতলা ষ্ট্রীট

বললেন—দেখ যদি যাস তো সকালের দিকে যাবি, অন্য সময় আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মুস্কিল।

ভদ্রলোকের ঠিকানাটা পকেটে ফেলে হাবু ফিরলো জীবনের সঙ্গে।

কথায় কথায় হাবু বললো—আমি আর পকেট মারতে পারবো না, যে মার খেয়েছি···হাজতে যা কষ্ট....

জীবন বললো—সে আমি বুঝেছি, আমি সাড়ে তিন হাজার

টাকা পকেট মেরে জমালুম, অথচ আমাকে একদিনও জেল খাটতে হোল না, আর তোর দু'দিন গেল না, হাজত ঘর ঘুরে এলি।

হাবু বললো—তাহ'লে এখন কি করবো?

—তাও ভেবেছি, আমি কাছে কাছে না থাকলে তোর চলবে না, আমারও একজন লোকের দরকার, তুই গাড়ীতেই থাকবি আমার সঙ্গে-সঙ্গে···

সন্ধ্যাবেলা জীবন তাকে নিয়ে বেরুলো, বললো—আজ আর গাড়ী নিয়ে বেরুবো না, চল্ একটা বায়স্কোপ দেখে আসি—।

সবাক ছবি হাবু একবার মাত্র দেখেছে, তার বাবার সঙ্গে: নিমাই সন্ন্যাসী। অবাক হয়ে সে শুধু ছবি দেখেছিল আর গান শুনেছিল, বেঞ্চিখানা যে ছারপোকায় ভরা তা সে মোটেই টের পায়নি। তার সঙ্গে আজকের এই বায়স্কোপ দেখার তুলনাই হয় না। এখনকার বসার চেয়ারগুলো কেমন আরামী, কথাগুলো কেমন স্পষ্ট। হাবু তন্ময় হয়ে যায়।

ছবি শেষ হলেও চেয়ার ছেড়ে তার উঠতে ইচ্ছে করে না।

পথে নেমে জীবন বললো—দেখ হাবু, তোকে যে বলেছিলাম,—ওই গাড়ীর ছাদ থেকে সুটকেস নিয়ে সরে পড়া—সেইটাই সব চেয়ে সুবিধা।

—কিন্তু আমি কি পারবো?

—ঠিক পারবি। আমি থাকতে তোর কোন ভও নেই। বাক্স নিয়ে তুই তো সরে পড়বি, লোকে তো ধরবে আমাকে, তোর ভয়টা কিসের? আমার ব্যবস্থা আমি সব ফয়সালা করে দেব ··

সারা রাত ধরে জীবন হাবুকে বোঝায়, কি ভাবে কি করতে হবে। যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হাবুর দিক থেকে আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না, তখন জীবন চুপ করে।

সকালে হাবু বললো—আমি তোর গাড়ীতে যাব না।

—কেন, কি হোল?

—গাড়ীর চাল থেকে তোর কথামত মালপত্তর টানতে আমি পারবো না।

—আজই টানবি কেন? দু'পাঁচদিন যাক, দেখে শুনে শিখে নে, তারপর···

—না, কোনদিনই আমি ওকাজ করতে পারবো না। বাবা বলতেন, 'সত্য পথে থাকলে কোন দিনই কষ্ট পেতে হয় না।' বাবার কথা শুনিনি বলেই আজ আমাকে বেত খেতে হোল, চুরি-জোচ্চুরী আমি আর করবো না।

—তাহলে খাবি কি করে?

—বিড়ি পাকাবো, রিক্সা টানবো···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব করবি, যাঃ—

—করেছিলামই তো, বিড়ির দোকানের কাজটা গেল তো শুধু তোর জন্য···

—বটে! কলকাতায় বিড়ি খাবার লোক না থাকলেও তোর চাকরী থাকতো?

হাবু আরো কি বলতে যাচ্ছিল, জীবন তার পিঠে এক চাপড় মেরেবললো—যা যা, সকালবেলা ঝগড়া করিস্ নে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, এক গ্লাস মিছরির সরবৎ খেগে যা—

তখনকার মত জীবন কথাটাকে হাল্কা করে দিলেও অত সহজে কিন্তু ব্যাপারটা চুকলো না, শেষ পর্যন্ত জীবনের সঙ্গে বেশ একটু মনান্তর হয়ে গেল। হাবুকে ছাড়তে হোল জীবনের আস্তানা।

নয়

হাবু মনস্থির করেই ফেলেছিল। ঠিকানা লেখা কাগজখানা কাছে ছিল, বরাবর মাণিকতলায় এসে অতুলবাবুর বাড়ীতে নক্ করলো।

অতুলবাবু কোথায় যেন বেরুচ্ছিলেন, হাবুকে দেখে বললেন,—তুই এসেছিস্, তা বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? বরাবর চলে এলেই তো পারতিস্ ভিতরে···

অতুলবাবু বরাবর হাবুকে উপরে নিয়ে এলেন, বললেন—বোস্। কিছু খাবি—চা? চপ? নিম্‌কি সিঙারা?

হাবুর মনে হোল, সে যেন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে এসেছে।

অতুলবাবু সামনের চেয়ারখানায় ভালো করে বসে বললেন—কি খাবি বল্?

হাবু অপরিচিতের কাছে এমনভাবে আপ্যায়িত হতে অভ্যস্ত নয় অপ্রতিভ হয়ে উঠে কথার দিক ঘুরিয়ে দেবার জন্য বললো—আপনি বেরুবেন না?

—না, তোর জন্য আজ আমার আর বেরুনো হোল না। তোর সব কথা এখন শুনতে হবে তো।

—আপনার কাজের ক্ষতি হোল···

—তা হোক, এই কাজটাও তো কিছু ছোট নয়।···যাক্ গে, আমার কাজ আমি বুঝবো'খন, এখন কি খাবি বল্? তারপর খেতে খেতে তোর কথা সব শুনবো।

হাবু কিছু না বললেও অতুলবাবু নিম্‌কি, সিঙারা ও চা আনালেন, তারপর সুরু হোল হাবুর কাহিনী:

"শীতের আমেজ সুরু হয়েছে, সামনেই পূজার ছুটি, ইস্কুলের টার্মিন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে, প্রথম হবার খবর বাবার কাছে বলতেই তিনি বললেন—'তুমি মেদনীপুরের ছেলে, বিদ্যাসাগর না হতে পার, শাসমল হবার চেষ্টা করবে—বড় তোমায় হ'তেই হবে।' বললেন, 'দোব, তুমি আগে বছরের পরীক্ষায় প্রথম হও, তোমাকে আমি কিনে দোব—তবে সে সাইকেল নয়, একখানি হোমিওপ্যাথিক বই" আর এক বাক্স ওষুধ। বইখানি আগাগোড়া পড়ে গরীব-দুঃখীদের তুমি চিকিৎসা করবে।' বললাম, 'আমি কি ডাক্তারী করবো, যদি যদি ওষুধ ভুল দিয়ে বসি?' 'কোন ক্ষতি নেই, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ভুল হলেও কোন অপকার করে না, ভয় পাবার কিছু নেই। ভুল হতে হতেই তো হাত পাকা হবে।' তখন সাইকেলটার জন্যই মন খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, সুবিধামত বাবাকে আবার বলবো। সাইকেল একখানা কিনতেই হবে। নতুন ফসল কাটা হবে, টাকা এসে পড়বে, তখন বলবো।...

"কিন্তু সে সুখের স্বপ্ন আকাশে মিলিয়ে গেল। সেই রাত্রেই উঠলো ঝড়। কে জানতো যে, এত বড় দুর্যোগ ঘটে যাবে। নিশ্চিন্ত মনে মার পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল, চাকতে মনে হোল, সমস্ত ঘরের চালটা যেন ভেঙ্গে পড়লো আমার মাথার উপর, একটা বেদনার ঝিলিক অনুভব করলাম বিদ্যুতের মত, তারপর সব অন্ধকার...

"চোখ যখন মেললাম, দেখি একেবারে এক অজানা ঘরে শুয়ে আছি, সারি সারি সব পড়ে আছে আমার মত। আর রামকৃষ্ণ-মিশনের গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীরা আমাদের সেবা করছেন।

"বিশেষ কিছুই আমার হয়নি, সাত-আট দিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ হয়ে উঠলাম। তারপর খুঁজতে বেরুলাম কেন্দ্রে কেন্দ্রে। আশেপাশে যেখানে যতগুলো সেবাকেন্দ্র হয়েছে সব ক'টায় খোঁজ করলাম, বাবা মা ভাইয়ের কোন সন্ধান পেলাম না। গাঁয়ে ফিরলাম, বাপের

জল তখন নেমে গেছে। কোথায় যে আমাদের বাড়ী ছিল তা আর ঠাহর করতে পারলাম না। গ্রামখানি যেন একদিনে আকাশের মত সমতল হয়ে গেছে, ঝাঁটা দিয়ে কে যেন সমস্ত বাড়ীগুলোকে পরিষ্কার করে নিয়ে গেছে, খেতের ধানও বাদ দেয়নি। থাকার মধ্যে শুধু বড় বড় গাছ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, আর আছে জলে-ডোবা আধ-পচা মানুষের দেহ।

"কোথায় কি করি, খাওয়া-দাওয়ারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তার উপর মন শোকাচ্ছন্ন। পনেরো দিন ধরে সেই অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালাম, তারপর চলে এলাম কলকাতায়।

তারপর…"

তারপর হাবুর জীবন-কথা আমরা সবটুকুই জানি।

অতুলবাবু বললেন—বেশ, তুই এখানেই থাক, কিছু কিছু কাজকর্ম করবি আর আমার কাছে পড়বি।

কারুর কথায় সহসা বিশ্বাস করতে হাবুর মন চায় না, জগাদা'র ব্যবহারের কথা তার মনে পড়লো। সন্দিগ্ধ মনে সে বললো—আমায় কি কাজ করতে হবে?

—প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ। আমার চিঠিপত্র নিয়ে যাবি, আমি যখন থাকবো না তখন লোক এলে অফিসে বসাবি, কি দরকার জেনে নিবি, ইত্যাদি।

হাবু এবার সত্যই ভরসা পায়, তাহলে অতুলবাবুর বাড়ীতে তাকে একেবারে বাসন-মাজা থেকে সুরু করতে হবে না, ভদ্র কাজই করানো হবে তাকে দিয়ে।

রাত্রে আহারাদি যা হোল হাবু তা আশা করেনি। চাকরকে লুচি আর বেগুন ভাজা খাওয়াতে পারে এমন লোক কলকাতায় কেন, সারা দেশে কত জন আছে হাবুর জানা নেই। অতুলদা বললেন—তুই এলি আজকে, এ তো একটা স্মরণীয় দিন রে, আজই তো লুচি খাবার দিন।

তারপর খেতে খেতে বললেন—ধর, আমি এক দেশের রাজা আর তুই আরেক দেশের রাজা, এসেছিস আমারসঙ্গে দেখা করতে। তোকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আমি বিরাট ভোজ দিচ্ছি। দেওয়াল, আলমায়ী, চেয়ার, টেবিলগুলোকে ধরে নেওয়া যাক্ আমাদের যত সব পাত্রমিত্র সভাসদ, আর আমরা দু'জন রাজা....কি বলিস্?

প্রাণখোলা হাসি হেসে অতুলদা খেতে সুরু করেন।

অতুলদার মা'ও ভারি চমৎকার মানুষ। ওই একটি মাত্র তাঁর ছেলে, ওকে নিয়েই তাঁর সংসার। খেতে বসে অতুলদা মায়ের কাছে সাড়ম্বরে বলে যান হাবুর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় কাহিনী। শেষে বলেন—সাবধানে থেকো মা, আজ থেকে তোমার এক পকেটমার ছেলে জুটলো, কবে সব পকেটে পুরে ছুট দেবে।

হাবু লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়, কিন্তু অতুলদার প্রাণখোলা হাসি সেই সঙ্কোচকে স্থায়ী হবার অবসর দেয় না।

আহারাদির শেষে হাবুর শোবার জায়গা হয় অতুলদার বিছানার পাশে, হাবু অনেকদিন বাদে একটু আরাম বোধ করে, এতদিনে তা'হলে ভগবান তাকে সত্যকারের একটা আশ্রয় মিলিয়ে দিলেন।

হঠাৎ এক সময় হাবু প্রশ্ন করে বসলো,—আচ্ছা অতুলদা, আপনি কি কাজ করেন?

—কাজ? মানে চাকরি? না, চাকরি আমি কিছুই করিনে, আর করবই বা কখন? অন্তরীণে ছিলাম আট বছর, এই তো মাস তিনেক হোল বেরিয়েছি।

—তাহলে টাকা পান কোত্থেকে, এই খাওয়া-দাওয়া,...খরচ...।

—বাবার কিছু টাকা আছে ব্যাংকে, তাইতেই চলে।

—যেদিন টাকা ফুরিয়ে যাবে?

—যখন যাবে তখন সে ভাবনা ভাবা যাবে, এখন সে ভাবনা ভেবে মরি কেন বল্?

অতুলদা গুন্ গুন্ করে গান ধরলো :

ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে

কি সঙ্গীত এক ভেসে আসে—

অতুলদা গুন্-গুন্ করে গান গায়, হাবু শোনে। গানের সব বাণী স্পষ্ট বুঝতে পারে না, ঘুমপাড়ানী গানের মত শোনায়, কিন্তু হাবুর চোখে ঘুম আসে না।

কোন এক সময় গান থামিয়ে অতুলদা জিজ্ঞেস করলো—এখনো ঘুমোস্ নি ?

—ঘুম পাচ্ছে না।

—খুব ভাবছিস্ বুঝি ? কিছু ভাবিস্‌নে রে। দেখ না তোকে কি করি। তোকে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে এমন মানুষ করে তুলবো যে তুই দেখবি লোকে তোর গলায় একদিন ফুলের মালা পরিয়ে দেবে, তখন বলবি যে অতুলদা বলেছিল।

হাবুর মনে পড়ে জগাদার কথা, সে-ও তো এই রকমই বলেছিল, কথায় আর কাজে কত তফাৎ। যাক্‌গে,…

সে ঘুমোবার চেষ্টা করে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল বলা কঠিন, সহসা অতুলদার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখনও অন্ধকার কাটেনি। সে জিজ্ঞেস করলো—আমায় ডাকছেন ?

—এই পোঁটলাটি ধর্। আয় আমার সঙ্গে।

—আলোটা জ্বালুন।

—না, আলো জ্বালা চলবে না, বাইরে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

—পুলিশ। পুলিশ কেন ?

—সে কথা পরে শুনবি, এখন আয় তাড়াতাড়ি করে—

খট্‌খট্ করে নীচের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হোল, ভারী গলায় কে বললো—দরজাটা একবার খুলুন তো।

—নে আয়—অতুলদা বললেন।

সে পোঁটলাটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

বরাবর ছাদে এসে অতুলদা বললেন—গাছে চড়া অভ্যাস আছে, পাঁচিল টপ্‌কাতে পারবি ?

—খুব খুব।

পাশাপাশি অনেকগুলি বাড়ীর ছাদই গায় গায়। পাঁচিলও উঁচু নয়। অনেকগুলিতে আবার পাঁচিল নেইও। ছাদের পর ছাদ পার হয়ে অতুলদা একেবারে সে পাড়াই পার হয়ে গেলেন। তারপর একটা তিনতলা বাড়ীর বারান্দায় লাফিয়ে উঠে বললেন—চল্, এইটে মেসবাড়ী, এইটে দিয়েই নেমে যাই।

অতুলদা তরতর করে নিচে নেমে এলেন। কে একজন লোক কলতলায় মুখ হাত ধুচ্ছিল, সে একবার জিজ্ঞেস করলো—কে, রমেশবাবু বুঝি ?

কিন্তু তার কথার কোন সাড়া না দিয়ে অতুলদা দরজা খুলে পথ বেরিয়ে পড়লেন।

সদর রাস্তায় এসে পোঁটলাটা হাতে নিয়ে অতুলদা বললেন—এই নে পাঁচ টাকার নোটখানা রেখে দে। যতদিন না কোন কাজকর্ম পাস্ চালিয়ে নিস্।

অতুলদা যে পালাচ্ছে, হাবু তা বুঝতে পারে। ওদের মেদিনীপুরেই তো সেদিনকার গান্ধী-হাঙ্গামার পর এমনিভাবে কতজন পালিয়েছে। বললেন—না অতুলদা, ও টাকা আমি নোব না, পথে তোমার কখন কোথায় দরকার হবে—

—আমাব দরকারের সময় আমি ঠিক জুটিয়ে নেব রে। আমার ভাবনা ভগবান ভাবছেন, তোকে আর ভাবতে হবে না, নে ধর।

নোটখানা অতুলদা তার হাতে গুঁজে দিলেন, তারপর বললেন—দেখ, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আমাকে চিনিস্ কি না, বলবি

'জানিনে, নামই শুনিনি কখনও।' আর আমার বাড়ীমুখো হস্‌নি দু'তিন মাস, বুঝলি ?

—মাকে কিছু বলে এলেন না···

—মা পুলিশ দেখলে সব ঠিক বুঝে নেবে, বলতে হবে না। তুই যদি কিছু বলতে যাস্‌ তোকেই তাহলে পুলিশ ধরবে।

—আমাকে কেন ? আমি কি করেছি ?

—কি করেছিস্‌ আর না-করেছিস্‌ সে বিচার পরে, এখন দু'চার মাস হাজতে থাকগে যা, তারপর সে কথা।

—বেশ, আপনি যখন বলছেন, যাব না। কিন্তু আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে অতুলদা ?

—বেঁচে থাকলে ঠিক একদিন দেখা হবে রে। এখন যাই, কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে রে। ও. কে. গুড্‌ নাইট্‌!

হাবুর পিঠে একটা মৃদু চাপড় মেরে অতুলদা হন্‌ হন্‌ করে পা চালালো। হাবুর চোখের সামনে ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে হারিয়ে গেল তাঁর গতি। অন্যমনস্কের মত পাঁচ টাকার নোটখানি হাতে নিয়ে হাবু নাড়াচাড়া করতে লাগলো। কানের মাঝে বাজতে লাগলো একটা সুর—ও. কে. গুড্‌ নাইট্‌।

মহানগরীর পথে আবার সুরু হোল হাবুর পথ চলা।

দশ

—কি রে।

হাবুর কাঁধে হাত দিয়ে কে একটা ঝাঁকানি দিল।

হাবু অন্যমনস্ক ছিল, চমকে ফিরে তাকালো। দেখে পিছনে দাঁড়িয়ে জীবন হাসছে।

জীবন বললো—এ ক'দিন কোথায় ছিলি রে? পাত্তা পাইনি।

—এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকরের কাজ নিয়েছি।

—চাকরের কাজ? ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাজার যাওয়া, বাসন মাজা, ছেলে ধরা? পারবি ওইসব কাজ করতে?

—কেন পারবো না, কত লোক তো করছে।

—তারা জানে তুই দাগী আসামী?

—জানে, জেনেই তারা আমাকে কাজ দিয়েছে।

—মানুষ ভালো বল?

—স্বদেশীর লোক, কংগ্রেসী।

—তাহলে তো মাইনে পাবি না। বেগার খাটিয়ে নেবে। ওদের তো রোজগার কিছু নেই, জেলে যায়, বেরিয়ে এসে মিটিং করে আবার জেলে যায়।

—আমার টাকার দরকার নেই, আমার দু' মুঠো খেতে পেলেই চলবে।

—বড় হবার ইচ্ছে নেই? পয়সা করতে চাস্ না?

—যে পথের ভিখিরী সে বড় হবে, পয়সা করবে, বিলেত যাবে, তুমি আর বকো না। আমার কপালে কি আছে, তা আমি জানি। বরাত ভালো হলে আজ আমি পথের ভিখিরী হতাম না।

-ঠিক আছে, যা ভাল বুঝিস্ কর, পরে কিন্তু আফশোষ করতে হবে।

হাবু হন্ হন্ করে হাঁটতে সুরু করলো। জীবনের সান্নিধ্য থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য জোরে জোরে পা চালালো।

পাশেই ট্রাম ও বাসের স্টপেজ। লোক উঠছে নামছে, অত্যন্ত ভীড়। এই ভীড়ে মানুষগুলো কি করে যাওয়া-আসা করে তাই ভাবে।

হঠাৎ চকিতে একটা লোক হাবুর পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল, যাবার সময় হাবুর বুক-পকেটে কি একটা ফেলে দিয়ে গেল, কানের কাছে বলে উঠলো—পালা—দৌড়ো!

হাবু চকিত হয়ে উঠলো। লোকটার পানে তাকিয়েই সে চিনতে পারলো—সে জীবন। জীবন ভীড়ের মধ্যে চট্ করে মিশে গেল, কিন্তু কি ফেলে গেল তার পকেটে? পকেট থেকে বেরুলো একটা ফাউণ্টেন পেন।

কার পেন? জীবন তার পকেটে ফেললো কেন? পকেট মারা পেন?

—এই যে রে, পেন এইখানে—দু তিনটি ছেলে হাবুকে ঘিরে ফেললো, একজন পেনটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল হাবুর হাত থেকে, তারপরেই কয়েকটা চড়-চাপড় এসে পড়লো হাবুর উপর। হাবু ক্ষণেক হতচকিত থেকেই চীৎকার করে উঠলো—আমায় কেন মারছ? আমি কি করেছি?

—ব্যাটা পিক্ পকেট।

—আমি কখন কার পকেট মারলাম? আমি তো এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

—এই পেন পেলি কোথায়?

ভীড় জমে গেল। পরে হাবুর চীৎকারে মারটা কমলো। হাবু তখন জোর গলায় চীৎকার করে উঠলো—তোমরা দেখেছ, আমি

পকেট মেরেছি। আমার পকেটে পেনটা ফেলে দিয়ে লোকটা পালিয়ে গেল…।

একদল লোক উগ্র হয়ে উঠলো, বললো—ছোঁড়াটা ওই দলের, ছাড়িস্ নে।

দু তিনজন বয়স্ক লোক বললো—দরকার কি মারধোর করে? থানায় নিয়ে যাও।

এমন সময় একজন পুলিশ এগিয়ে এলো। পুলিশ ভীড় হাল্‌কা করবে কি পুলিশকে ঘিরেই বচসা স্থরু হয়ে গেল।

বচসা চলতেই থাকতো, বাঙ্গালীর বিশেষত্ব কোন কথা একবার স্থরু হলে তা আর শেষ হতে চায় না, ইতিমধ্যে মোটর সাইকেলে এক সার্জেণ্ট এসে পড়লো। বললো—কিসের ভীড়?

পাহারাওলার মুখ থেকে সব শুনে বললো—কার পেন পিক্‌-পকেট হয়েছিল থানায় চলুন, কেস লেখাবেন, পথে ভীড় করবেন না।

কারও সাড়া পাওয়া গেল না।

পুলিশ-কেসের ঝামেলা পোহাতে কেউ চায় না।

—যত সব ঝুট ঝামেলা,—বিরক্তিভরে সার্জেণ্ট ভীড় হটিয়ে দিল।

হাবু চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, এখন সে বুঝতে পারলো মাথার মধ্যে টিপ টিপ করছে, মার খেয়েছে যথেষ্ট। সার্জেণ্ট তার মুখের পানে তাকিয়ে বললো—তুই পকেট মেরেছিলি বুঝি? তোর মুখখানা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

—আমি কিচ্ছু জানি না।

—না, তোর চেনা মুখ, তুই দাগী আসামী।

হাবু কেঁদে ফেললো।

হঠাৎ সার্জেণ্টের মুখের ভাব বদলে গেল, বললো—তোর নাম কি?

—হাবু।

—বাড়ী কোথায়

—মেদিনীপুরে।

—মেদিনীপুরে কোথায়?

—কাঁথি, নবগ্রাম।

সার্জেন্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকালো, বললো—তুই কি কমল মাস্টারের ছেলে?

হাবু এবার ভালো করে সার্জেন্টের মুখের পানে তাকালো, বলে উঠলো—পূর্ণদা।

—এখানে কোথায় আছিস্?

—একজনের বাড়ীতে চাকরের কাজ করছি?

—তোর বাবা-মা? ছোট ভাইও ছিল না একটা?

—সবাই তো বাণে ভেসে গেল, আমি একা শুধু রক্ষে পেয়েছি।

সার্জেন্ট হাবুর মুখের পানে তাকিয়ে ক্ষণেক কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—আয় আমার সঙ্গে।

সার্জেন্ট হাবুকে মোটর বাইকের সাইড-কারে তুলে নিলে।

অনেকদিন পরে একজন জানা-চেনা মানুষ পেয়ে হাবুর মন খুলে গেল। পূর্ণবাবুকে সে অনেক কথাই বললো। অতুলদার বাড়ীতে আশ্রয় পাওয়া অবধি কোন কথাই বাদ দিল না।

পূর্ণবাবু বললেন—ঠিক আছে, তোকে আমি একটা চাকরি দোব।

—কি চাকরি?

—সিভিক গার্ড। খাঁকি পোশাক পরে এক জায়গায় বসে আটঘণ্টা ডিউটি দিবি, মাইনে পাবি ত্রিশ টাকা, তাতেই তোর চলে যাবে।

পূর্ণবাবু সেইদিনই হাবুকে সিভিক-গার্ডে ভর্তি করে দিলেন।

কলিকাতায় ব্ল্যাক-আউট চলছে। সন্ধ্যার পর থেকেই সব অন্ধকার। পথে আলো জ্বলে না। দোকানের আলো ঢাকা দেওয়া, কোন বাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরে আলো আসে না মোটর গাড়ী ছোটে অন্ধকারেই। বহু বাসিন্দা কলিকাতা ছেড়ে চলে গেছে।

হাবু সিভিক-গার্ড। ডিউটি পড়েছে রাত্রে। বস্তির সামনে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র করা হয়েছে, সেখানে হাবুকে থাকতে হয় রাত আটটা থেকে। সত্য নামে আরেকটি ছেলেও সেখানে আসে। সত্য এক একখানি গোয়েন্দা-কাহিনীর বই নিয়ে আসে, রাত বারোটা অবধি পড়ে বইখানি শেষ করে বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ে। হাবুরও বই পড়তে ইচ্ছে করে, ডিটেক্‌টিভ বইয়ের গল্প ভারী জমে যায়, কিন্তু বই সে পাবে কোথায়, সত্য বলে—তোকে বই দিলে আমার পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, আমি ভূতের মত চুপ করে অন্ধকারের পানে তাকিয়ে বসে থাকতে পারবো না।

কথাটা মিথ্যে নয়, চারিপাশের ভূতুড়ে অন্ধকারের পানে তাকিয়ে হাবুর ক্লান্তি এসে যায়, মাঝে মাঝে দেয়ালে ঠেস দিয়ে সে চোখ বুজে ঝিমোয়। তবে বসে তাকে থাকতেই হয়।

সত্য বলে—তুই সারারাত বাইরে রোয়াকে বসে থাকিস্ কেন? ঘরে এসে ঘুমো, যখন সাইরেন বাজবে তখন তার ব্যবস্থা হবে।

হাবুবলে—না, বাইরের হাওয়ায় থাকতেই আমার ভাল লাগে। এখানে বেশ হাওয়া বয়।

সত্য আর কিছু বলে না। গল্পের গোয়েন্দা যখন একটা একটা করে খুনের সূত্র আবিষ্কার করতে সুরু করেছে তখন কথা বলে সময় নষ্ট করতে সত্যর মন চায় না।

সত্য বই পড়ে, হাবু রোয়াকে বসে ঝিমোয়।

দিনের পর দিন এই একইভাবে চলতে থাকে।

একদিন রাত ন'টার সময়েই সাইরেন বেজে ওঠে। হাবু সজাগ হয়ে ওঠে। সত্যও ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সামনের বস্তিটার ভিতরে ছুটো জানালা দিয়ে আলোর আভাষ দেখা যাচ্ছে। সত্য বললো—দেখ তো হাবু, ওই বাড়ীটা থেকে আলো বেরুচ্ছে কেন?

হাবু ঢুকে পড়লো গলিটার মধ্যে। জানালার সামনে গিয়ে দেখে ঘরের মধ্যে একটা লোক একা বসে বিড়ি পাকাচ্ছে। হাবু

হাঁক দিল—কি গো, সাইরেন শুনতে পাওনি বুঝি? আলো ঢাকা দাও।

বিড়িওলা বললো—আলো ঢাকা দিয়ে কি করে কাজ করি বলো তো বাবু?

—তাহলে জানালাটা বন্ধ করে দাও।

—জানালা বন্ধ করে এই ঘরে বাঁচবো কেমন করে?

—এখন কাজ করার দরকার নেই, আলো নিভিয়ে দাও।

শুনতে পাচ্ছ না, মাথার উপর প্লেনের আওয়াজ হচ্ছে? আলো দেখলেই তো ওরা বোমা ফেলবে।

—ফেলুক না, এমনিই তো আধমরা হয়ে বেঁচে আছি। একেবারে মরলে তো বাঁচি।

—তুমি কি একা মরবে নাকি? আরো কতজন মরবে ত জানো?

—এই বস্তি-শুদ্ধ সবাই মরবে মরুক, এইভাবে জানোয়ারের মত বেঁচে থাকার চেয়ে মরাও ভালো।

প্লেনের শব্দ স্পষ্ট হলো। শব্দ কাছে আসছে। হাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলো, বললো—এখনি নিভিয়ে দাও।

—আলো আর নিভাই কেন, তার চেয়ে জানালাই বন্ধ করে দিই, আজ রাতে হাজার বিড়ি আমায় শেষ করতেই হবে।

বিড়িওলা কোল থেকে বিড়ির কুলো নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো, এতক্ষণে তার মুখখানি হাবু দেখতে পেল, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো—অতুলদা নাকি?

বিড়িওলা সামনের জানালাটা বন্ধ করতে এলো, হাবু জিজ্ঞাসা করলো—তোমার নাম কি?

বিড়িওলা বললো—আবার নাম কেনে কর্তা, জানালা তো বন্ধ করে দিছি।

—তোমার নামটা কি বল না?

—বাদ্‌শা মিঞা, আমি বিড়ি-পাকানো বাদ্‌শা।

বাদ্‌শা মিঞা সামনের জানালাটা বন্ধ করে দিল। হ্যারিকেনের আলোয় যেটুকু দেখা যায় হাবু তাইতেই অবাক হয়ে গেল, একেবারে অতুলদা—শুধু দাড়িটার জন্যই বুঝি বাদ্‌শা মিঞা হয়ে গেছে।

ফিরে এসে হাবু সত্যকে প্রশ্ন করে—সত্যদা, স্বদেশীর লোকেরা ছদ্মবেশ ধরে?

—শুধু স্বদেশীর লোকেরা কেমন?—সত্য জবাব দিল—খুনী,

জালিয়াৎ, গোয়েন্দা সবাই ছদ্মবেশ ধরে, ঠিকমত ছদ্মবেশ ধরা একটা মস্ত আর্ট।

হাবু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বাদ্‌শা মিঞা কি সত্যি অতুলদার ছদ্মবেশ?

এমন সময় গুম গুম করে বোমা ফাটার শব্দ শোনা যায়। তাকিয়ে দেখে মাথার উপর অনেকগুলি চলন্ত তারা আকাশে ভেসে যাচ্ছে। এ যেন একটানা মৃদু মেঘের গর্জন আর বজ্রপাত।

সত্য বলে—হাবু, ঘরের মধ্যে চলে আয়, সেল্‌টার নে। একটা বোমা পড়লে আর রক্ষে নেই।

—কি হবে? মরে যাব—হাবু বললো—আমার মা বাবা ভাই সবাই মরে গেছে আমিও মরে যাব, ঝামেলা চুকে যাবে।

—তোর আপনার লোক কেউ নেই?

—না।

—তবে যে বলিস্ মাসীমার বাড়ী থাকি···মাসীমা, অতুলদা···

—আপন মাসীমা নাকি? অতুলদা দয়া করে থাকতে দিয়েছেন তাঁর বাড়ীতে। আপনার লোক নন।—স্বদেশীর লোক তো! ওরা মানুষের অনেক ভালো করে।

—সব সময় ভাল করে না, অনেক সময় বোমা ছুঁড়ে মারে।—সত্য বললো—ওরা ভাবে দু' দশটা বোমায় দু' দশজন ইংরাজকে মেরে দিতে পারলেই তারা রাজ্য ছেড়ে পালাবে। অত সহজ হলে ইংরেজদের এতো কেল্লা, গুলি গোলা কামান বন্দুক রয়েছে কি জন্যে। এতো বড় রাজ্য কেউ কখনো এতো সহজে ছেড়ে দেয়? ওরা পৃথিবী জোড়া রাজ্য চালাচ্ছে, ওরা অত সহজে ভয় পাবার ছেলে। হাতে-নাতে ধরতে পারলেই এদেরকে ফাঁসীতে লটকে দেবে।

হাবু অনেককাল আগে মণ্ডলদের পুকুরপাড়ের এক গাছে একটি লোককে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখেছিল, ফাঁসীর কথায় সেই

দৃশ্যটি মনে পড়ে। সেই লোকটির জায়গায় অতুলদাকে কল্পনা করতেই মনে কষ্ট হয়, হাবু বলে ওঠে—না, না।

বুম্ বুম্ করে ছুটো বোমা ফাটার আওয়াজ হয়। মাথার উপর অনেকগুলি আলোর চলাফেরা দেখা যায়। সত্য তাড়াতাড়ি হাবুর হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নেয়।

'অল-ক্লিয়ার' হয়, রাত তখন বারোটা বেজে গেছে।

হাবু তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো, বললে—একবার ঘুরে দেখে আসি।

ব্ল্যাক-আউটের রাত, দেখার কিছুই নেই। হাবু পথের মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালো। আশে-পাশের বাড়ীতে মানুষের গলা শোনা যায়, কিন্তু সবই অন্ধকার।

হাবু অন্যমনস্কভাবে এসে ঢুকলো বস্তির গলিটার মধ্যে, বরাবর এসে দাঁড়ালো বাদ্‌শা মিঞার জানালার ধারে। বাদ্‌শা মিঞা বিড়ি পাকাচ্ছে না, আলোর সামনে এসে লেখাপড়ার কাজ করছে। বিড়িওলা লেখাপড়া করে দেখে হাবুর অবাক লাগে। বাদ্‌শা মিঞা কয়েক টুকরো কাগজে কি সব লিখলো। তারপর ঘরের এক কোণে কাগজের মোড়ক করা বিড়ির বাণ্ডিল পড়েছিল, লেখা কাগজগুলো ছোট করে ভাজ করে সেই বাণ্ডিলগুলির মধ্যে এক একখানি করে ভরতে লাগলো।

ঝপ্ করে কে একজন হাবুর হাতখানা চেপে ধরলো—কি দেখছিস্?

হাবু কোন জবাব দেবার আগেই লোকটা হাবুর হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে। বললো—ছোঁড়াটা জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিল, ধরে এনেছি।

বাদ্‌শা একবার তাকিয়ে নিয়ে নিজের কাজে মন দিল। বললো—ওকে আমি চিনি, গলির মোড়ের সিভিক গার্ড।

—সিভিক গার্ড? জানালায় দাঁড়িয়ে কি দেখছিল?

—ওকে দেখছিলুম—হাবু বাদ্‌শাকে দেখিয়ে দিল—ওকে দেখতে অতুলদার মত কিনা তাই।

—অতুলদা কে?

—যার বাড়ীতে আমি থাকি। তিনি পুলিশের ভয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

—ফেরার হয়েছেন তো এখানে কি?

—এক রকম দেখতে।

—বাদ্‌শা শুনছিস্ তো?

—তুই বড় বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাস দিনু—বাদ্‌শা বললো—ওকে ছেড়ে দে, কাজ-কারবারের কথা বল।

—তুই এখানে কি করছিস্?—সত্য দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো—আরে ছোটমামা, তুমি এখানে?

দীনু মুখ ভেংচে উঠলো—না, এরা জ্বালাবে দেখছি, এক মিনিট সোয়াস্তি নেবে না।

—বারে,—সত্য বললো,—তুমি কদ্দিন বাড়ী ছাড়া···

—তাতে তোর কি? আমার বাড়ীতে যদি আমি না থাকি।

—দেখা হলে কথা বললে দোষ হলো?

—আমি কথা বলতে চাই না, দেখা করতে চাই না, তবু, তোরা আমার পিছনে লেগে থাকবি কেন?

—বেশ, আর কথা বলবো না।

—হ্যাঁ, আমাকে তুই চিনবিনি, আমার সঙ্গে কথা বলবিনি।

—বেশ। হাবু, চলে আয়।

হাবু একলাফে সত্যের পাশে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ দীনু বললো,—পুলিশে খবর দিতে যাচ্ছিস্?

—আমার বয়ে গেছে।

—তুই বড্ড বাজে বকিস্ দীনু—বাদ্‌শা ধমক দিলে—সত্য, টাকা নিবি?

সত্য বেরিয়ে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়ালো।

পথে বেরিয়ে দিনু বললো,—তোর নামটা কি বললি?

—হাবু।

—বেশ মুখ বুজে আমাদের সঙ্গে চল।

গলি-ঘুঁজির ভিতর দিয়ে অন্ধকারে তিনজন দ্রুত এগিয়ে চললো।

নীরবে প্রায় দু'মাইল পথ অতিক্রম করে তে-মাথার মোড়ে একখানি বাড়ীর দরজায় এসে বাদ্‌শা দাঁড়ালো, বললো—দীনু, এই বাড়ী তো?

—হ্যাঁ।

নতুন বাড়ী, কোল্যাপ্‌সিবল লোহার দরজা। দরজার মাথায় কলিং বেলের বোতাম ছিল, বাদ্‌শা বোতাম টিপলো। বার তিনেক বোতাম টেপার পর ভিতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল—কে?

তারপরেই পাশের জানালায় একটি লোকের ছায়া দেখা গেল।

বাদ্‌শা জবাব দিল—বাবুকে খবর দাও, বল তারা এসেছে।

—বাবু তো শুয়ে পড়েছেন।

—ডেকে তোলো, আমাদের এখনি কথা বলে যেতে হবে।

—এতো রাতে?

—সাইরেন বাজলো বলেই তো রাত হলো। এখন তাড়াতাড়ি খবর দাও।

কয়েক মিনিট পরেই সদর দরজা খোলা হলো। দেখা গেল বাড়ীর কর্তাকে।

বাদ্‌শা বললো—লক্ষ্মীনারায়ণবাবু, আমরা আসছি মেদিনীপুর থেকে। আপনাকে খবর পাঠিয়েছিলাম যে একদিন আমরা যাবো, আজ এলাম।

—খবর পাঠিয়েছিলেন?

—যেদিন আপনি চালের নৌকো নিয়ে এলেন, সেদিন

আপনাকে একটা ছেলে বলেনি, যে পাঁচটা গ্রামের চাল সরানোর জন্য আপনাকে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। বিদ্যুৎ-বাহিনী আপনার জরিমানা ধরেছে।

—আপনি কি বলছেন আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

—বেশী বোঝার দরকার নেই। গত সপ্তাহে পাঁচখানা গ্রাম থেকে চাল সরানোর জন্য আপনার উপর জরিমানা হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা। সেই টাকার প্রথম কিস্তি আজ আপনাকে দিতে হবে। পাঁচ হাজার টাকা আমাদের এখনি চাই।

—আপনি কি রাতদুপুরে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন? আমি এখনি পুলিশে ফোন করবো।

—ফোন আপনি করতে পারেন, পুলিশ আমাদের ধরার আগেই আপনার লরী দু'খানি যাবে, আর মধুপুরের বাড়ীতে যে ছেলেমেয়েদের রেখে এসেছেন, সেই ছেলে দুটিকে আর খুঁজে পাবেন না।

লক্ষ্মীনারায়ণ কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারলো না।

বাদশা বললো—আপনার জন্য পাঁচখানা গাঁয়ে অন্নকষ্ট দেখা দিয়েছে, সে তুলনায় পঁচিশ হাজার টাকা খুব বেশী নয়। তা-ও আমরা একসঙ্গে চাইছি না, দুটো বা তিনটে কিস্তিতে দিন, এখন পাঁচ, তারপর দু'বারে দশ দশ।

লক্ষ্মীনারায়ণবাবু তখনও সাড়া দিলেন না।

বাদশা বললো—আমরা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না। যদি না পারেন তো বলুন আমরা চলে যাই।

এবার লক্ষ্মীনারায়ণ ধীরে ধীরে বললেন—এখনি পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে? অতো টাকা এখনই পাই কোথায়? হাজারখানেক নিন।

—ঠিক আছে, আমরা চললাম। পঁচিশ হাজার আমরা আর নোব না। আপনাকে পঞ্চাশ হাজার দিতে হবে একেবারে। আমরা আপনার কোন রকম চালাকি বরদাস্ত করবো না।

দেখছেন তো—জার্মান পিস্তল, একসঙ্গে সাতটা গুলি চলে, শব্দ হয় না।

হাতের পিস্তলটা অন্ধকারে বাড়িয়ে ধরলো বাদ্‌শা। লক্ষ্মীনারায়ণবাবু ভালো করে ঠাহর করতে পারলেন না। তবু আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন, বললেন—না না, গুলি ছুঁড়বেন না, আমি টাকা দোব।

—না না, আপনাকে এখন গুলি করবো কেন? আপনাকে জিনিসটা দেখিয়ে রাখলাম, দরকার হলে আপনার, অথবা আপনার দুই ছেলের একখানা করে পা খোঁড়া করে দেওয়া যেতে পারে। তবে মনে হয় তার দরকার হবে না, আপনি টাকা ভালভাবেই দিয়ে দেবেন।

লক্ষ্মীনারায়ণবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, টাকাটা আমি দিয়ে দোব, ওসব বন্দুক পিস্তলের দরকার নেই।

—দিন্। তাড়াতাড়ি করুন, আমাদের সময় খুব কম। আর সব দশ টাকার নোট দেবেন। বড় নোট ভাঙাতে গিয়ে হাঙ্গামা হবে। ছোট নোটই ভাল।

লক্ষ্মীনারায়ণবাবু ভিতরে চলে গেলেন। তিনজন পথের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল।

মিনিট দশেক হয়ে গেল। লক্ষ্মীনারায়ণবাবুর দেখা নেই। বাদ্‌শা আবার কলিং বেল টিপলো। চাকরটা দৌড়ে এলো।

বাদ্‌শা রুক্ষস্বরে বললো—বলে দাও আমরা চললাম, সময় নেই।

পরক্ষণেই লক্ষ্মীনারায়ণ ছুটে এলেন, বললেন—না না, যেতে হবে না, আমি এনেছি। এইখানে কি গুণে নেবার সুবিধা হবে?

—গোনার দরকার নেই, কম থাকলে পরে আদায় করে নোব।

পকেট থেকে একটা ছোট থলি বের করে বাদ্‌শা তাড়াতাড়ি নোটের তাড়াগুলি তার মধ্যে ভরে নিল। তারপর বললো—দেশের

কাজে এই পাঁচ হাজার টাকা দান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

বাদ্‌শা হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে সুরু করে দিল।

দীনু ও হাবু তার অনুসরণ করলো।

একটু এসেই একটা পার্ক। পার্কে এক গাছতলায় বসে বাদ্‌শা থলির ভিতর থেকে দুশো টাকা বের করে হাবুর হাতে দিল, বললো—এই নে, তোর একশো, আর সত্যর একশো। যা, এবার এখান থেকে সরে পড় দিকি।

হাবু বেরিয়ে এলো পার্ক থেকে।

অন্ধকার পথ। পকেটে দুশো টাকা। নিঝুম রাত। একা ফিরতে হাবুর গা ছম্‌ ছম্‌ করতে লাগলো।

কোন মতে অনেক ঘুরে-ফিরে হাবু যখন ফিরলো, রাত তখন দুপুর। সত্য তখনও জেগে বসেছিল, বই পড়ছিল।

হাবু একশো টাকার একটা বাণ্ডিল তার সামনে তুলে ধরলো। বললো—বাব্বা, সে কি এখানে, সেই খালধার থেকে আসছি। যা ভয় করছিল!

সত্য নোট দশখানা গুণে ফেললো, তারপর হেসে বললো—টাকার জন্য সব কষ্টই সওয়া যায়। তা, তোকে কিছু দেয়নি?

—আমারও আছে একশো।

—ঠিক আছে, ক'দিন খুব ফুর্তি করা যাবে। সিনেমা আর রেস্টুরেণ্ট,—মোগলাই পরটা আর ফাউল কাটলেট।

—না,—হাবু বললো—আমি ওভাবে টাকা ওড়াতে পারবো না, আমি টাকার জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছি, আমি টাকাটা মাসীমার কাছে জমা রাখবো।

—মাসীমা কেন, আমার কাছেই জমা রাখ না, আমি সুদ দোব।

হাবু বললো—না।

—বেশ, তোর যা মন চায় করগে যা, আমি বাড়ী চললুম।

সত্য চলে গেল।

সকালে ঝাড়ুদারের গাড়ীর শব্দে হাবুর ঘুম ভাঙলো। ঘরে চাবি দিয়ে, রাস্তার কলে মুখ ধুয়ে নিয়ে হাবু বাড়ীর পথে রওনা হলো।

অতুলের মা স্নান সেরে ঠাকুরঘরে ঢুকছিলেন, হাবু ডাক দিল—মাসীমা, কাল অতুলদার সঙ্গে দেখা হলো। এক মুখ দাড়ী রেখেছেন, এক মুসলমান বস্তির মধ্যে বাদ্‌শা মিঞা সেজে বসে বসে বিড়ি পাকাচ্ছেন। কিছুতেই চেনা দেবেন না, আমিই বা সহজে ছাড়বো কেন?

হাবু গর্‌গর্‌ করে সব কথা বলে গেল, তারপর পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করে বললো—এই টাকাটা এখন তোমার কাছেই রাখো মাসীমা, দরকার হলে আমি নোব।

মাসিমা নোটগুলির পানে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—ওটাকা তো আমি ঘরে তুলতে পারবো না বাবা, ও তুই তোর বাক্‌সেই রাখ।—ও তো ধর্মের পয়সা নয় বাবা, ও লুঠের টাকা।

হাবু অবাক হয়ে মাসীমার মুখে পানে তাকালো, তারপর ক্ষুণ্ণভাবে বললো—অতুলদা দিলেন···

—অতুল যা করবে তাই ভাল কাজ বলে অতুলের মাকেও মেনে নিতে হবে?—মাসীমা হাসলেন, বললেন—ওই টাকাটা তুই রাখ্‌ তোর বাক্‌সে, আমি ওটাকা ঘরে তুলবো না।

মাসীমা ঠাকুরঘরে ঢুকে গেলেন।

হাবু কয়েক মুহূর্ত হাতের নোটগুলির পানে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

টাকার একন্টা মস্ত গুণ আছে, যখন যার হাতে যায় তখনই তার চিত্ত প্রসন্ন করে তোলে। হাবুরও আজ সকাল থেকেই বেশ খুসি-খুসি ভাব। তার ছোট সুটকেসটার মধ্যে দশটাকার দশখানা নোট আছে, কথাটা যত ভাবে ততো মনটা খুসি হয়। মনে ফুর্তি থাকলে এলোমেলো পথে ঘুরতে বেশ লাগে। সহরের পথ প্রায় জনশূন্য। ট্রামগাড়ীগুলো প্রায় খালি। দোকান খোলা আছে কিন্তু খদ্দের নেই। সব মানুষ বোমা পড়ার ভয়ে সহর ছেড়ে চলে গেছে। ফাঁকা পথ দিয়ে মাঝে মাঝে হুড়হুড় করে মিলিটারী ট্রাকের সারি ছুটে যাচ্ছে সার দিয়ে।

হাবু আন্‌মনে ঘন্টাখানেক ঘোরাফেরার পর এক পার্কে গিয়ে বসলো। প্রসন্ন চিত্তে হাবু বেঞ্চির উপর পা দু'খানি তুলে দিল।

ছুর্‌হুড় করে মিলিটারী লরী আসার আওয়াজ হয়। ঝড়ের মত গাড়ীগুলি বেরিয়ে যায় সামনে দিয়ে। তারপরেই একটা হৈ-চৈ ওঠে, কিছু লোক ছুটে যায় একদিকে। হাবুও পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়ে।

পথের একপাশে অনেক মানুষের ভীড়। ফুটপাতের পাশে একটা রিক্‌সা উল্টে পড়েছে, আর খানিক তফাতে ছুটি লোক টান হয়ে পড়ে আছে পথের উপর। মিলিটারী লরী ধাক্কা মেরেছে।

মানুষ ছুটির নাক মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে, বেশভূষা দেখলেই বোঝা যায় একজন রিক্‌সাওয়ালা আর একজন আরোহী। আরোহীর পকেটের পেন আর হাতের হাতঘড়িটা রোদ লেগে ঝক্‌ঝক্ করছে।

আবার হুড়হুড় করে শব্দ হলো। আবার একসারি লরী বায়ুবেগে ছুটে গেল। ট্রাকের সৈনিকরা মৃতদেহ ছুটি দেখে জনতার পানে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।

মিনিট ছুয়েক পরেই এলো এম-পি লেখা একখানি মোটার-বাইক। তার পিছনে এম্বুলেন্স, মৃতদেহ ছুটিকে তুলে নিয়ে তারা চলে গেল।

ভীড়ের ভিতর থেকে একজন বললো—ব্যস্, মৃতদেহ শুদ্ধ গাফ্ হয়ে গেল। বাড়ীর লোকেরা একটা খবর অবধি পাবে না।

আরেকজন বললো—খবর পেয়েই বা কি হবে? রোজই তো এইভাবে ছু'-দশটা করে যাচ্ছে। অত্যাচারের প্রতিবিধান তো কিছু হচ্ছে না।

—কে প্রতিকার করবে? মিলিটারীর সঙ্গে যুঝবে কে?

—আমাদেরকেই যুঝতে হবে।

—তাহলে গুলি খেয়ে আরো মরবে।

—এভাবে কুকুরের মত পথে পড়ে মরার চেয়ে মারামারি করে গুলি খাওয়া অনেক ভাল।

যে কথা বলছিল, হাবু তার মুখের পানে তাকালো—আরে, এ যে সত্য! হাবু তার কাছে এগিয়ে গেল, ডাকলো—সত্যদা!

সত্যও হাবুকে দেখতে পেয়েছিল। এগিয়ে এসে হাবুর কাঁধে হাত দিল, বললো—চল।

পথ চলতে চলতে হাবু বললো—তুমি এখানে থাকো নাকি সত্যদা?

—না না, মামার বাড়ী এসেছিলাম, দিদিমাকে ছোটমামার খবরটা দিয়ে গেলাম।—তারপর গলার স্বরটা নামিয়ে আস্তে আস্তে বললো—একটা নতুন খবর শুনে এলাম—জাপান থেকে সুভাষ বোস বক্তৃতা করছেন।

—সুভাষ বোস?

—হ্যাঁ, এখন জাপানে আছেন, বক্তৃতা করছেন রেডিওতে, আজ ধরবো তাঁর বক্তৃতা। রাত সাড়ে দশটায়।

– আমিও শুনবো।

—শুনিস্।

সন্ধ্যার পরেই শহর নিঝুম, ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার থম্‌থম্ করতে থাকে। সিভিক্ গার্ডের আড্ডায় বসে যথারীতি সত্য উপন্যাস পড়ে, আর বাইরের রোয়াকে বসে হাবু অন্ধকারের পানে তাকিয়ে থাকে।

পাশের বাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত দশটা বাজলো, হাবু বললো—কখন যাবে রেডিও শুনতে?

—যাবো আবার কোথায়, উপরে গঙ্গাদার ঘরে। সন্ধ্যাবেলায় এসেই গঙ্গাদাকে বলে রেখেছি। যেই টাইম হবে ডাকবে।

এমন সময় উপর থেকে ডাক পড়লো—সত্য, সত্য, উপরে আয়—!

—চল্—চল্—তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে, হাবুকে নিয়ে সত্য

উপরে উঠে গেল। উপরের ঘরে তখন রেডিও চলছে, গঙ্গা ইশারায় বসতে বললো। সত্য ও হাবু একপাশে তক্তাপোষের উপর বসে পড়লো। মৃদুকণ্ঠে ইংরাজীতে বক্তৃতা হচ্ছে—'আমি সুভাষ, আমি আপনাদের বলছি। আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যান, আমি উপযুক্ত সময় আপনাদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হবো।... আমি সারাজীবন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি, এখন ভারতের স্বাধীনতার জন্য শেষ সংগ্রাম করবো।...গ্রামে গ্রামে রক্ষীদল গঠন করুন। আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রস্তুত হচ্ছে, এক বছরের মধ্যে তারা ভারতে পদার্পণ করবে, তখন এই গ্রামরক্ষীদল তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে, ইংরেজদের ভারত ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। স্বাধীনতা যাঁরা চান তাঁদের প্রাণপণ লড়তে হবে। এই সংগ্রামে পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। পূর্ণ স্বাধীনতা না পাওয়া অবধি এই সংগ্রামের বিরাম নেই। আপনারা একই পতাকার তলে সমবেত হোন।...'

মাঝে মাঝে কট কট করে শব্দ হচ্ছিল, শোনা যাচ্ছিল না, এবার এমন শব্দ হতে সুরু করলো যে কিছুই আর শোনা গেল না। টিউনের সুইচটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে খানিক চেষ্টা করার পর গঙ্গা হতাশভাবে বললো—এরা বাধা দিচ্ছে, আর শোনা যাবে না।

—কারা বাধা দিচ্ছে ?

—এখানকার স্টেশন থেকে বাধা দেয়, যাতে কোন শব্দ শোনা না যায়। এদের মিথ্যে কথাগুলো তাহলে ধরা পড়ে যাবে যে!

হাবু চুপ করে রেডিওটার পানে তাকিয়ে থাকে, ভাবে মানুষ মানুষকে ভুল বোঝাবার জন্য কত আয়োজনই করে, ন্যায় ও সত্যকে চাপা দিতে মানুষ সদাই ব্যস্ত।

কয়েক মিনিট কর্-কর্ শব্দ শোনার পর গঙ্গা রেডিও বন্ধ করে দিলে।

সত্য উঠে পড়লো, হাবুকে বললো—চল্, আমরা নীচে যাই।

সারাটা দিন হাবুর মনে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার কথাগুলিই আলোড়িত হতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলা সেলটারে এসেই বললে—সত্যদা, আজও একটু বলে রেখো না। আজকেও বার্লিন শুনবো।

—আজ আর নতুন কি শুনবি,—গঙ্গাদা বলে—ওই একখানা রেকর্ড করা আছে, ওরা রোজ শোনায়।

—রেকর্ড করা আছে? সুভাষবাবু কাল নিজে বলেননি?

—একবার বলেছিলেন, ওরা রেকর্ড করে রেখেছে। রোজ রোজ রাত সাড়ে দশটায় এতো বক্তৃতা দেবার সময় তাঁর কোথায়?

—বাবার কাছে শুনেছিলাম এক একজন নেতা নাকি সকাল আটটা থেকে রাত দশটা অবধি বক্তৃতা দিতে পারেন।

—আরে, সে সুভাষবাবুও পারেন, তবে সময় থাকা চাইত। নেতার তো অনেক কাজও আছে!

হাবুর ইচ্ছা হয় কোন নেতাকে একবার কাছাকাছি দেখার জন্য। বলে— সত্যদা, তুমি কোন নেতাকে দেখেছ?

—কত—ক-ত। নেতাদের আড্ডাই তো কলকাতা।

—আমার কিন্তু নেতাদের দেখতে বড় ইচ্ছা করে।

—এখন নেতা তুই পাবি কোথায়? কংগ্রেসী নেতাদের সবাইকে ধরে তো জেলে দিয়েছে, বাইরে তো কেউ নেই।

—কংগ্রেসী ছাড়া কি নেতা হয় না?

—হবে না কেন? হিন্দু মহাসভার নেতা আছেন ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে।

—তুমি আমাকে নিয়ে যাবে ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের কাছে?

—যেতে চাস যাবি, এই তো ভবানীপুরে বাড়ী, সকালে গেলেই দেখা হবে। কিন্তু তুই গিয়ে কি বলবি?

—কিচ্ছু বলবো না, একটা নমস্কার করে চলে আসবো।

—বেশ, যেদিন বলবি নিয়ে যাবো।

-কাল সকালে ?

-আচ্ছা।

পরদিন সকালে আটটা থেকে দশটা অবধি দাঁড়িয়ে থেকেও সত্য ও হাবু ডক্‌টর শ্যামাপ্রসাদের দেখা পেলে না। সেই সকালেই তিনি বেরিয়েছেন, কোথায় কি এক জরুরী আলোচনা আছে, দু' ঘণ্টাতেও তিনি ফিরলেন না।

সত্য বললো—চল্ আজ যাই, আরেকদিন আসবো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা হয়ে গেল।

—এসো না, একটু বসি।

—এই পোষাকে ফুটপাতে বসে থাকলে লোকে হাসবে।

দু'জনেরই পরণে খাঁকি সিভিক-গার্ডের পরিচ্ছদ।

দু'জনেই পাশাপাশি হাঁটতে সুরু করলো।

রোদটা চন্‌চনে হয়ে উঠেছে। সত্য বললো—এই রোদে হাঁটতে ভাল লাগছে না। ট্রামে যাই।

হাবু বললো—আমার কাছে পয়সা নেই।

—অতগুলো টাকা কি করলি ?

—মাসীমার কাছে জমা দিয়েছি।

—বেশ করেছিস্। সব জমিয়ে রাখ্। আজ রাতে যদি বোমা পড়ে তোদের বাড়ী-ঘর সব খতম হয়ে যায়, তাহলে টাকাগুলো কি হবে ? বাক্‌সেই থাকবে তো। আর ট্রামের তিনটে পয়সা বাঁচাতে গিয়ে দুপুর রোদে তিন মাইল হাঁটবি।

—বেশ তো, তুমি এখন আমাকে ধার দাও, মাইনে পেলে শোধ দোব।

—তিন পয়সার ধারের কারবার সত্য করে না। একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গে যাবো, একজনের পয়সা না থাকলে আরেকজন

দেবে। এতে ধার-দেনার কি কথা আছে। আমরা দোকানদারি করতে বসেছি?

দু'জনে ট্রাম-স্টপের সামনে এসে দাঁড়ালো।

দুটি লোক ফুটপাত ধরে তাদের পাশ কাটালো। লোক দুটির মুখের পানে চোখ পড়তেই হাবু চমকে উঠলো, তাড়াতাড়ি সত্যর হাত ধরে ফিস্ ফিস্ করে বললে—অতুলদা আর তোমার মামা।

সত্যর অন্যদিকে চোখ ছিল। সে মুখ ফেরালো। পথিক দু'জন তখন এগিয়ে গেছে। গায় চাদর, পৈতা ঝুলছে, পায়ে চটি, হাতে নতুন গামছা বাঁধা পুটলি। সত্য বললো—ও তো দুজন পুরুত, কোথাও পুজো করে সিধে নিয়ে ফিরছে।

—মুখ দুটো দেখেছ?—হাবু বললো—মুখ দেখলে তুমি আর বামুন বলতে না।

—তুই ঠিক দেখেছিস্?

—চল না, এগিয়ে দেখবে।

লোক দুটি বেশ ধীরে সুস্থে পথ চলছিল, সত্য ও হাবু তাদের অনুসরণ করলো।

খানিকটা গিয়ে তারা কালিঘাটের দিকে বেঁকলো। সত্য এবার জোরে জোরে পা চালিয়ে লোক দুটির সামনে গিয়ে পড়লো। একবার তাদের মুখের পানে তাকিয়ে ডাকলো—ছোট মামা।

কোন সাড়া না দিয়েই বামুন দু'জন এগিয়ে চললো।

সত্য আবার ডাকলো—ছোট মামা।

এবার তারা থামলো, সত্যর মুখের পানে তাকিয়ে একজন বললো—আমায় ডাকছ?

—বারেঃ, তুমি আমায় চেনো না?—সত্য বললো।

মানুষটির চোখে মুখে বিস্ময় দেখা দিল, বলে উঠলো—কে?

—তুমি তো ছোট মামা? তুমি বিনয় বোস নও?

—তুমি মানুষ ভুল করেছ, আমার নাম গণেশ ভট্‌চায্যি ; বোসের কখনও পৈতে থাকে ?

সত্য তো থ'। হাবুও কম অবাক হয়নি, অপরজনের মুখের পানে তাকিয়ে সে বললো—আপনি অতুলদা নন ?

—আমি? আমার নাম কার্তিক হালদার, আমি হালদার বাড়ীর ছেলে। কেন বলত ?

—ঠিক এইরকম দু'জন লোককে আমরা চিনি।

—হতে পারে, একরকম চেহারার মানুষ তো কতই দেখা যায়।

সত্য ও হাবুকে অবাক করে দিয়ে কার্তিক ও গণেশ পাশ কাটালো।

ওরা এগিয়ে গেল।

সত্য বললো—ব্যাপারটা কি হলো। আমার ছোট মামাকে আমি চিনি না ?

হাবু বললো—দু'জন মানুষ তো একরকম হতেই পারে।

—এমন একরকম হয় না। দু'দিন আগে বাদ্‌শা মিঞা, দীনু মিঞা, আজ কার্তিক গণেশ, মানিকজোড় ঠিক আছে,চোখ-মুখ ঠিক আছে, নাম বদলাচ্ছে, আর ভোল বদলাচ্ছে। আমাদের এড়িয়ে যাবার জন্য পরিচয় অস্বীকার করলো। ওরা ঠিক ছোট মামা আর অতুলদা।

কার্তিক গণেশ কালীমন্দিরের পথ ধরলো। গলির বাঁকের মুখে তারা চোখের আড়ালে চলে গেল। দু'জনে এবার তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মন্দিরে এসে উঠলো, কার্তিক গণেশ কোথাও নাই।

সত্য বললো—আমাদের দেখেই গা ঢাকা দিয়েছে। আমি যা সন্দেহ করেছি ঠিক তাই, ওরা দু'জন অতুলদা আর ছোট মামা ছাড়া আর কেউ নয়।

দু'জনে আবার ট্রাম রাস্তায় ফিরে এলো।

বিকালের দিকে ভবানীপুর অঞ্চলে বড় রাস্তার উপর এক

হুলুস্থুলু ঘটে গেল। মিলিটারী ট্রাক তো প্রায়ই যাওয়া-আসা করে এই পথে। এক একবার আটখানি দশখানি ট্রাক্ সারবন্দী হয়ে হু হু করে ছুটে যায়, কিছুই গ্রাহ্য করে না। সামনে কোন মানুষ, কি গাড়ী পড়লে তার আর নিস্তার নেই। একটি ছোট ছেলে পথ পার হতে গিয়ে চাপা পড়লো। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ মারা গেল। পর পর ট্রাকগুলি বেরিয়ে গেল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না।

কিছুক্ষণ পরেই পল্লীর ছেলেরা যত ঠেলা গাড়ী আর ডাস্টবিন এনে জড়ো করলো এক গলির মুখে, তারপর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে সমস্ত রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী হয়ে গেল। গলির মধ্যে বাড়ীর আড়ালে জড়ো হলো ঝুড়ি-ঝুড়ি ইট। আড়ালে ছেলেরা ওঁৎ পেতে বসে রইল। সন্ধ্যার কিছু আগেই খান দুয়েক ট্রাক হু হু করে ছুটে এলো। পথের উপর বাধা—যাবার পথ নেই। গাড়ীগুলি থামতে বাধ্য হলো। ট্রাক থেকে সৈন্যরা নেমে ঠেলাগাড়ী ও ডাস্টবিন সরিয়ে পথ পরিষ্কার করার উদ্যোগ করলো।

ঠিক সেই সময় দু'দিকের গলি থেকে সুরু হলো অজস্র ইষ্টকবর্ষণ। সৈনিকেরা বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো। পিছনের দু-তিনখানি গাড়ী থেকে দুমদাম করে কয়েকটি গুলি ছুঁড়লো, কিন্তু তাতে ইট মারা বন্ধ হলো না। বন্দুক হাতে সৈনিকেরা দু'দিকের গলির মধ্যে ঢুকতে গেল, কিন্তু পারলো না। পথের ব্যারিকেডের সঙ্গে কিছু কিছু খড়ও ছিল, পাশের এক বাড়ী থেকে কয়েকটি আগুনের জ্বলন্ত ন্যাকড়ার বল এসে পড়লো সেই খড়ের উপর, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। দু'খানি ট্রাক ছিল সামনেই, পেট্রল ট্যাংকে আগুন ধরে গেল, ইষ্টকবৃষ্টি এবার সুরু হলো পুরোদমে। সৈন্যদের মধ্যে এবার হৈচৈ পড়ে গেল।

পিছনের ট্রাকগুলি আগুনের ভয়ে তাড়াতাড়ি খানিকটা পিছিয়ে গেল। যে সব সৈন্যরা ট্রাক থেকে নেমেছিল, তারা সবাই এবার

লাফিয়ে ট্রাকে উঠে পড়লো। পথের জ্বলন্ত ব্যারিকেড পাশ কাটিয়ে চারখানি ট্রাক ফুটপাতের উপর দিয়েই দৌড় দিল।

মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যেই এতটা ব্যাপার ঘটে গেল।

সৈন্যরা চলে যাবার পর ছেলেরা গলি থেকে বেরুলো। ছ'খানি খালি ট্রাক জ্বলছে আর জ্বলছে ডাস্টবিনের খড়ের গাদা।

ছ'জন লোক ছেলে-ছোকরাদের নেতৃত্ব করছিল, সব দেখেশুনে তারা বললো—এই হলো পথ, এইভাবে ওদের শায়েস্তা করতে পারলে এই বেপরোয়া মানুষ চাপা দেওয়া বন্ধ হবে।

সেই গোলযোগের মধ্যে একখানি বাস এসে পড়লো সেই পথে। সামনে আগুন দেখে বাসখানি পাশের রাস্তায় ঘুরে গেল। ছ'জন যাত্রী সেইখানেই নেমে পড়লো, সত্য ও হাবু।

সত্য বললো—আমরা আর ঘুরে যাই কেন? রাস্তা পার হয়ে মন্দিরের দিকে চলে যাই।

হাবু বললো—রাস্তা জুড়ে এতো আগুন জ্বেলেছে কেন?

সত্য বললো—তুই খবরের কাগজ তো পড়িস্ না, তুই একেবারে নাবালক। পথে আগুন জ্বালা, খানা কাটা, এসব চলছে ক'মাস ধরে। কংগ্রেসী নেতাদের এরা জেলে পাঠিয়েছে, গান্ধিজী বলেছেন—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে,' দেশ থেকে ইংরেজকে তাড়াও, সেজন্য যদি গুলি খেয়ে মরতে হয় তা-ও ভালো।

হাবু বললো—রাস্তায় সেজন্য আগুন জ্বালাতে হবে কেন?

—ইংরেজরা সৈন্য দিয়েই তো দেশশাসন করছে, লড়াই চালাচ্ছে। পথ না পেলে তাদের গাড়ী চলবে কেমন করে?

—পথ তো আর একটা নয়, অন্য পথ দিয়ে যাবে, ট্রেনে যাবে।

—ট্রেনের লাইনও কি ঠিক থাকছে নাকি, অনেক জায়গায় রেললাইন উপড়ে ফেলে দিয়েছে।

—তাহলে তো ট্রেন উল্টে যাবে?

—যাচ্ছে।

—মানুষ মরছে ?

—মরছে।

—পুলিশ কিছু বলছে না ?

—দেশের সব মানুষই যদি ক্ষেপে যায়, ক'জন পুলিশ কি করবে ?

—ট্রেন উল্টে যাবে লোক মরবে—এ কেমন ধারা স্বদেশী হলো ? স্বদেশী করার মানে তো দেশের মানুষের ভালো করা।

—স্বদেশীর আসল কথা হলো দেশকে স্বাধীন করা। স্বাধীন হলে নিজেদের ভাল আপনিই হবে। এতো বড় দেশকে স্বাধীন করতে হলে কিছু মানুষ তো মরবেই।

পিছনে মোটারবাইকের শব্দ পাওয়া গেল। সত্য তাড়াতাড়ি হাবুর হাত ধরে পাশের এক গলির মধ্যে ঢুকে গেল। লম্বা সোজা গলি, দ্বিতীয় মানুষ নেই। ছুটে পালাতে সময় লাগবে। সত্য ছুটতে সুরু করলো, বললো—ছোট্, পুলিশ আসছে।

পুলিশের বাইক ততক্ষণে গলির মুখে এসে গেছে। গলির মধ্যে তাদের দু'জনকে ছুটতে দেখেই সার্জেণ্ট গুলি চালালো। ফট ফট করে দু'বার গুলির আওয়াজ হলে। হাবুর আগে আগে সত্য যাচ্ছিল, গুলি খেয়ে পড়ে গেল। সত্যকে পড়ে যেতে দেখেই হাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সার্জেণ্ট বাইক থেকে নেমে রিভলভার হাতে নিয়ে তেড়ে এলো। সত্যের বুকে গুলি লেগেছিল, হাবু, দাঁড়িয়েছিল তার পাশে। সার্জেণ্ট হাবুকেও গুলি করতে যাচ্ছিল, তার পরণে সিভিক-গার্ডের খাঁকি পোশাক দেখে গুলি আর করলো না. হাতের পিস্তলটা মুখের সামনে দুলিয়ে তর্জন করে উঠলো—গো—গো—যাও এখান থেকে।

হাবু হতচকিত হয়ে সার্জেণ্টের মুখের পানে তাকালো, সার্জেণ্ট হাবুকে বাঁ হাত দিয়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারলো, হাবু ঘুরে পড়ে গেল পথের উপর। ঠিক সেই সময় দু'খানি ইট সট সট করে সার্জেণ্টের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। সার্জেণ্ট আর দাঁড়ালো না,

মোটারবাইকের দিকে দৌড়ালো। নিরাপদে বাইকে উঠে সে সরে পড়লো। হাবু ততক্ষণে উঠে বসেছে। সত্যর বুকের রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে তার পাশ দিয়ে। সত্যর গায়ে হাত দিয়ে হাবু ডাকলো—সত্যদা।

ওদিকের একটি বাড়ীর আড়াল থেকে এবার একটি লোক ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। সত্যর পানে একবার তাকিয়ে নিয়ে, হাবুর কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললো—দেখছিস্ কি, ও শেষ হয়ে গেছে।

—মরে গেছে—হাবু আর্তকণ্ঠে বললো।

—হ্যাঁ, ওরা খুন করে গেছে।

হাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল।

আগন্তুক বললেন—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে? বাড়ীতে একটা খবর দিগে যা।

—ও এখানে পড়ে থাকবে?

—পড়ে থাকবে না, আমরা দেখছি। বাড়ীতে বলবি একেবারে কেওড়াতলা চলে আসতে। বলবি, ওর ছোট মামা আছে।

হাবুর এতক্ষণে খেয়াল হলো, বক্তার মুখের পানে তাকিয়ে দেখলো, সকালের সেই পূজারী বামুন বেশে অতুলদা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। অতুলদা হাবুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন—আর দাঁড়াস নি, এখনি অন্ধকার হয়ে যাবে। যা—

হাবু যত সহজে খবর দেবে মনে করেছিল, ব্যাপার তত সোজা হল না। সত্যর দাদা বাড়ী ছিল, কয়েকটা প্রশ্ন করেই আসল খবরটা বের করে ফেললো। তারপর মাকে নিয়ে তারা এলো, কালীঘাটের শ্মশানে। মা এসেই সত্যর রক্তাক্ত দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শ্মশানে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল।

এগারো

সারারাত হাবু শ্মশানেই বসে রইল। সকালে মৃতের অস্থি গঙ্গায় দিয়ে সত্যর দাদা ফিরে গেলেন। হাবু তখন নিভন্ত-চিতার পানে তাকিয়ে বসে আছে। অতুলদা বললেন—কি রে হাবু, বাড়ী যাবি নে?

—বাড়ী ফিরে কি করবো?

—মা তো ভাবছে।

হাবু চুপ করে তাকিয়ে থাকে অতুলের মুখের পানে।

অতুলদা বললেন—একটা খুন দেখেই তুই হাত পা ছেড়ে বসে পড়লি, এই রকম খুন আজকাল দু'দশটা রোজই হচ্ছে। একটা দেশ স্বাধীন করতে গেলে এমন দু'দশটা মরবেই।

—সত্যদা তো স্বদেশী করতে যায়নি—হাবু বললো।

—ঝড় যখন বয় তখন কি কোন বাড়ীর বিচার করে? কোন্ বাড়ীটা ভাল লোকের কোন্ বাড়ীটা মন্দ লোকের তা দেখে? বাণ যখন এলো তখন তোর বাবা-মা ভাই ভেসে গেল কেন, তারা কোন দোষ করেছিল? দেশের বুকের উপর দিয়ে এখন বিপ্লবের ঝড় বহে যাচ্ছে, কোন্ গুলিটা কার লাগবে কেউ জানে না। আজ সত্যর লাগলো কাল তোর আমার লাগতে পারে, তবে এই রকম যত বেশী লাগবে ততই আমাদের লাভ।

—লাভ?

—হ্যাঁ, এখনও কিছু মানুষ আছে যারা ইংরেজদের ভক্তি করে, তাদের মনে ঘা লাগবে। এখন দরকার—যেন ইংরেজের কোন বন্ধু এদেশে না থাকে।

—তোমরা খালি হাতে পারবে ইংরেজদের সঙ্গে?

—এবার বোধ হয় পারবো। বাইরের মার খেয়ে ওরা কাবু হয়েছে, এখন ভিতরের মার খেলেই ওরা পালাবে।

হাবু হতাশভাবে বললো—কিছুই হবে না, তুমিও কবে সত্যদার মত গুলি খেয়ে মরবে।

অতুলের চোখ দুটো ক্ষণেকের জন্য জ্বলে উঠলো, তিনি বললেন—কেন কিছু হবে না? যদি কিছু না-ও হয়, এই যে সত্যকে খুন করে গেল, এই খুনের তো শোধ নেওয়া হবে।

—খুন করবে?

—না, ওরা যেভাবে নিরীহ মানুষকে খুন করছে, আমরা সেভাবে খুন করবো না। আমরা লড়বো। সুভাষবাবু এসে পড়েছেন বর্মায়, সৈন্য নিয়ে তিনি এগিয়ে আসছেন, সেই দলে ভিড়ে যাবো, বন্দুক কাঁধে নিয়ে লড়াই করবো।

হাবু সহসা প্রশ্ন করে বসলো—সুভাষবাবুর দলে আমরা লড়াই করতে পারি না।

—সবাই পারে, দশ-বারো বছরের ছেলেরাও আছে সেই দলে।

—তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব অতুলদা।

—তুই যাবি,—অতুল হাবুর মুখের পানে একবার ধারালো চোখে তাকালো, তারপর বললো—তা তুই আমাদের সঙ্গে যেতে পারিস্, তোর কোন বন্ধন নেই—তুই মুক্ত পুরুষ।

—কবে যেতে হবে?—হাবু উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

—আমাদের কি যাবার দিনক্ষণ আছে নাকি? হয়তো এখনই বেরিয়ে পড়তে পারি।

হাবু ফস্ করে বলে ফেললো—সত্যদার হত্যার শোধ তুলতে হবে।

সন্ধ্যার খানিক আগে হাবুকে দেখা গেল ট্রাম থেকে নেমে কালীমন্দিরের দিকে চলেছে, হাতে একটা র‍্যাশন ব্যাগ। মন্দিরের

কাছাকাছি গিয়ে পড়তেই একটা বাড়ীর দোতলায় বারান্দা থেকে অতুলদার ডাক শুনতে পেল—হাবু, আয় উপরে আয়।

দরজা খোলা ছিল, সামনের সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই চোখে পড়লো, অতুলদা ও বিনয়বাবু বসে আছে। অতুলদা বললো—থলিতে কি আছে ?

হাবু বললো—জামা কাপড় গামছা।

—তৈরী হয়েই এসেছিস্, কোথায় যেতে হবে জানিস তো ?

—কোথায় ?

—আসামের জঙ্গলে। বাঘ আছে, সাপ আছে, হাতী আছে, তাদের কারও সঙ্গে দেখা হলে আর রক্ষা নেই।

—যা হয় হবে, আপনাদের সঙ্গে যাবো, অতো ভয় আমার নেই।

—মরার ভয় করিস্ না ?

—কি হবে ভয় করে ? সত্যদা যে এক মিনিটে খুন হয়ে গেল, সে তো আর জঙ্গলে যায়নি।

অতুল ক্ষণেক চুপ করে রইল, তারপর বললো—বোস, সন্ধ্যে হোক তারপর বেরুবো।

হাবু বসলো।

বিনয় অপ্রসন্ন মুখে বললো—তুমি আবার একে জোটালে কেন ? এ কি আমাদের সঙ্গে হাঁটাহাঁটি করে পারবে

—না পারে, ফিরে আসবে—অতুল বললো।

—দল বড় হলে ঝামেলা বাড়ে।

কিন্তু ছোট ছেলেমেয়ে সঙ্গে থাকলে পুলিশে সন্দেহ করে না, পুলিশ জানে বিপ্লবীরা সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘোরে না।

—আজকের পুলিশ আর ততো বোকা নেই, আমাদের চট্টগ্রামে ছোট ছেলেমেয়েরা কি হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলতে পারে তা তারা ভালমত দেখেছে।

—ভালই তো—অতুল বললো—ছোট ছেলে যদি বড় কাজ

করতে পারে তো আমাদের সঙ্গেও একটা ছোট ছেলে থাক না। আমরা যদি মরে যাই, ওই আমাদের কাজ শেষ করবে।

—আবার ভয় পেলে আমাদের পুলিশে ধরিয়েও দেবে।

—ও তেমন ছেলে নয় বিনু, ও পকেটমার দলের ছেলে, তুমি ওকে যত সহজ মনে করছ ততো সাধারণ ও নয়। কি রে হাবু, তুই পকেট মারতিস্ না?

হাবুর মুখ লাল হয়ে উঠলো।

তার মুখের পানে তাকিয়ে অতুলদা পিঠ চাপড়ে দিলেন, বললেন—ঘাবড়াও মৎ, জীবনটা একটা খেলা—হয় ওরা গোল দেবে নয় আমরা গোল দেব। ভাল করে খেলতে গিয়ে যদি চোট্ খেতে হয় তো হবে। চোট্ খাবার ভয় নেই তো তোর?

হাবু বললো—না।

—তাহলে ঠিক আছে, চল্—মৃত্যু ভয় যার নেই সে সব কিছু করতে পারে।

খানিক পরেই তিনটি মানুষ সেই বাড়ী থেকে বেরুলো, অতুল, বিনয় ও হাবু। তিনজনের হাতে তিনটি ছোট র‍্যাশন ব্যাগ। বরাবর চেৎলার কাঠের পুল পার হয়ে তারা মাঝেরহাটের দিকে চললো। তাদের দেখলে তখন সহরতলীর গ্রাম্য লোক ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

মাঝেরহাট স্টেশন থেকে ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেনে তারা উঠে পড়লো। কামরা খালি। জানালার পাশে এক কোণে বসে বাইরের অন্ধকারের পানে তাকিয়ে সহসা হাবু মনে মনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো, আজ থেকে সে আর রিকসাওয়ালা পকেটমার দাগী আসামী নয়, সে বিপ্লবী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক।

হাবু বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে অন্ধকারের পানে তাকিয়ে রইল। ট্রেনের ঝক ঝক ঝাঁকানির তালে তালে তার মাথার মধ্যেও ধক্ ধক্ করতে লাগলো—স্বাধীনতার সংগ্রাম—হাবু তার সৈনিক—সূর্যোদয়ের পথে সে এক তীর্থযাত্রী।